॥ ৫ম সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০১৫-ফেব্রুয়ারি ২০১৬

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/২

প্রবন্ধ:

- "সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে – সজীব চাকমা/৩

বিশেষ প্রতিবেদন:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিভ্রান্তিকর ভাষণ/১৩
- সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার কর্তৃক প্রদত্ত সংসদীয় বক্তব্য/১৯
- বিজিবির বরকল ও ছোটহরিণা জোন কম্যান্ডারের হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর বাজার বর্জন/২১
- পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করে সার্কেল চীফদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকরাও স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানে মন্ত্রণালয়ের পুন:অভিমত/২২
- আঞ্চলিক পরিষদ ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কাপ্তাই-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-ঠেগা রাস্তার জরিপ শুরু/২৪
- ক্ষমতাসীন দলের নজীরবিহীন ভোট ডাকাতির মাধ্যমে রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচন/২৫
- পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের দাবিতে ঘুনধুম থেকে ধুধুকছড়ার ৩০০ কি:মি:সহ সারাদেশে গণ-মানববন্ধন/২৭
- আপামর জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ক্ষোভের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি পালিত/৩১

সংবাদ প্রবাহ:

- যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা/৩৮
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবর দখল/৪০
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন/৪৫
- সংগঠন সংবাদ/৪৭
- আন্তর্জাতিক সংবাদ/৫৬

সম্পাদকীয়....

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সরকার একদিকে যেমন সম্পূর্ণ অচলাবস্থার মধ্যে রেখে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার অপপ্রচারণার একধরনের ছায়াযুদ্ধ জোরদার করেছে। পূর্বের মতো রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব খাটিয়ে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার জোরদার করেছে সরকারের বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৌলবাদী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তথা কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল যেমনি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে, সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেও তেমনি এই মহল লুকিয়ে রয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও এসব গোষ্ঠী নানা উদ্ভট ও কল্পকাহিনী অবতারণা করে চুক্তির বিরোধিতা করেছিল। বর্তমানেও তারা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার ধোঁয়া তুলে এবং জুম্মদের পৃথক জুম্মল্যান্ড বা স্বাধীন দেশ গঠনের অলীক কল্পকাহিনী অবতারণা করে বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অপপ্রচারের অংশ হিসেবে সম্প্রতি 'সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতা' শিরোনামে লেখা ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও গুইমারা রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: তোফায়েল আহমেদ, পিএসসি-এর প্রবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক ও সরকারি প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি আগাগোড়ায় বিভ্রান্তিমূলক, একদেশদর্শী, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, জাতি-বিদ্বেষী, বর্ণবাদী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী। আশ্চর্যের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বদৌলতে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনায় এ ধরনের একটি চুক্তি পরিপন্থী, মনগড়া, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, বিকৃত তথ্যেভরা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের চুক্তি বিরোধী, সুবিধাবাদী ও পদলেহনকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা সম্পর্কেও সহজে ধারণা লাভ করা যায় যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও বিপজ্জনক।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র যথাযথভাবে তুলে ধরতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ভাষণে তিনি পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে বলে চর্বিত চর্বন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়ন না করেও তিনি তাঁর বক্তব্যে 'সম্পূর্ণ' বা 'আংশিক' বাস্তবায়নের দাবি করেছেন যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় ভাষণে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে এক দিক-নির্দেশনা থাকবে বলে জনসংহতি সমিতি আশা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণে সেই দিক-নির্দেশনার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ন্যায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কেবল উন্নয়নের বিবরণই তুলে ধরেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে পূর্বের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন, সর্বোপরি পূর্বের ন্যায় আবারও চুক্তি বাস্তবায়নে তার সরকারের আন্তরিকতার কথা একইভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা শুনতে শুনতে মানুষ একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য পরিসংখ্যান তুলে না ধরে ১ এপ্রিল ২০১৫ জনসংহতি সমিতির সভাপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশকৃত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো পরিচিহ্নিত করে চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য জনসংহতি সমিতি সরকারকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রবন্ধ

"সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

সজীব চাকমা

'সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতা' শিরোনামে লেখা ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও গুইমারা রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: তোফায়েল আহমেদ, পিএসসি-এর প্রবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক ও সরকারি প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রথমে চার দফায় প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রামের 'দৈনিক পূর্বকোণ'-এর ২৯, ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৫ এবং ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে। এরপর চোখে পড়ে জাতীয় দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' ও 'যায় যায় দিন' এর যথাক্রমে ৩১ জুলাই ২০১৫ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের সংখ্যায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত শিরোনামে। সর্বশেষ দেখা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা কর্তৃক সম্পাদিত ও সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রকাশিত 'রেগেক্ষ্যয়ং' নামক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রকাশনায়।

প্রবন্ধটির বহুল প্রচারণা দেখে এটা বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না যে, এ প্রবন্ধটির লেখার পেছনে অতিশয় সুক্ষ্ম উদ্দেশ্য রয়েছে। 'শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন'-এর মতো একটি চিত্তাকর্ষক শিরোনাম ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ে, ১৯৯৭ সালে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রসঙ্গে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল বাসিন্দা জুম্ম জনগণ সম্পর্কে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রচারণা চালানোর নিমিত্তে এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রবন্ধটি আগাগোড়ায় বিভ্রান্তিমূলক, একদেশদর্শী, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, জাতি-বিদ্বেষী, বর্ণবাদী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বদৌলতে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনায় এ ধরনের একটি চুক্তি পরিপন্থী, মনগড়া, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, বিকৃত তথ্যেভরা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখে।

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী:

প্রবন্ধটি বিভ্রান্তিকর, মনগড়া ও কাল্পনিক বক্তব্য দিয়েই শুরু করা হয়েছে। প্রবন্ধকার জনাব তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন যে, "...পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যারা সিনলুন, চিন, আরাকান, ত্রিপুরা, বার্মা এবং অন্যান্য এলাকা থেকে আনুমানিক মাত্র তিনশ থেকে পাঁচশ বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আবাস স্থাপন করেছে। ...অথচ এদেশে বাঙালি বা তাদের পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতে শুরু করেছে প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকে।" প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, "সুপ্রাচীন কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ"।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ড. আহমদ শরীফ-এর মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন- "আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখন্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে এদেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ় ও পুন্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনোমানুষ গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ছিল।" ড. আহমদ শরীফ আরো লিখেছেন যে, "বস্তুত ব্রিটিশ পূর্বকালে আজকের বাংলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল বলে প্রমাণ নেই। কাজেই বাংলার সার্বিক ইতিহাসের ধারণা-কল্পনা সম্ভব নয়। আমরা যখন বাংলার আদি ইতিহাসের কথা বলি, তখন আমরা আবেগবশে সত্যকে অতিক্রম করে যাই, কেননা জানা তথ্য আমাদের সে অধিকার দেয় না।" ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- "প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। যুগে যুগে ইহার সীমা ও আয়তনের পরিবর্তন হইয়াছে.... বঙ্গাল পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম ছিল।"

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ নেপাল থেকে শুরু করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশের মধ্য-উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও উপকূল অঞ্চল (বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল), বর্তমান আরাকান পর্যন্ত পার্বত্য জনপদগুলোতে ছিল মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। মধ্যযুগে হিমালয়ের পাদদেশ আসাম, উত্তর বঙ্গ এবং বাংলাদেশের কিয়দংশ অঞ্চল ব্যাপী কাছারী, অহোম, কামাতা, চুটিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর আবাসভূমি ছিল।[১] তারও দক্ষিণে ত্রিপুরা মহারাজার রাজ্য বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রামের কিয়দংশ ও চাঁদপুরসহ মেঘনা নদীর পূর্ব পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও চট্টগ্রাম কিয়দংশ এলাকা (ফেনী নদী পর্যন্ত) নিয়ে চাকমা জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন সামন্ত রাজ্যের উপস্থিতি ছিল। এমনকি চট্টগ্রামসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল কখনো কখনো আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে গেছে বলেও ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে।[২] উক্ত আলোচনা তথা ড. আহমদ শরীফ ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে 'সুপ্রাচীন কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক জনিত কারণে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ' বা 'পার্বত্য চট্টগ্রামে চার হাজার বছর আগে থেকে বাঙালিরা বসবাস করছে' এমনটা বলা যায় না।

ভৌগোলিক কারণে না হয় অধুনা বাংলাদেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অবিচ্ছেদ্যতা রয়েছে, যেমনি রয়েছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ

১ http://en.wikipedia.org/wiki/Kachari_Kingdom

২ Dr. A.M. Serajuddin, 'The Chakma Tribe of Chittagong Hill Tracts in the 18th century: Journal of Royal Asiatic Society, No- 1, 1984' by and Sunity Bhushan Kanungo, 'Chakma Resistance to British Domination', 1998

ইত্যাদি রাজ্যের ভৌগোলিক অবিচ্ছেদ্যতা। কিন্তু ঐতিহাসিক জনিত কারণে কতটা অবিচ্ছেদ্যতা রয়েছে তা স্পষ্ট নয়। বেশী দূরের কথা নয়, যেখানে বর্তমান কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল। ত্রিপুরা মহারাজার রাজবাড়ি, পুকুর ও ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনো নি:শেষ হয়ে যায়নি। সেসময় কুমিল্লাকে ত্রিপুরা বলা হতো। একসময় বাংলাদেশ আসামেরই অংশ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের চেয়ে বরঞ্চ ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি ভূখন্ডের সাথে বাংলাদেশের একটা অধিকতর নিবিড় ঐতিহাসিক অবিচ্ছেদ্যতা রয়েছে।

বস্তুত প্রাক-উপনিবেশিক আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সামন্ত রাজার অধীনে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। জোয়াও দে বেরোজ নামে জনৈক পোর্তুগিজ ঐতিহাসিক ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত মানচিত্রে এই সামন্ত রাজ্যটিকে CHACOMAS (চাকোমাস) হিসেবে নির্দেশ করেন। ১৭৬৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা নিযুক্ত চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রথম প্রধান কর্মকর্তা মি. হেনরী ভেরেলস্ট "চাকমা রাজা শেরমুস্ত খানের আমলে ফেনী নদী থেকে সাঙ্গু এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি পাহাড় পর্যন্ত এ রাজ্যের সীমানা ছিল" বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো তাঁর Chakma Resistance to British Domination গ্রন্থে লিখেছেন, মোঘল ও নবাবী আমলে রাঙ্গুনিয়া, রাউজানসহ বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কার্পাস বা তুলা মহল হিসেবে পরিচিত ছিল। পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলার ব্যবসায়ীদের সাথে পার্বত্য এলাকার জুম্মদের পণ্য বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে চাকমা রাজারা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস বা তুলা চট্টগ্রামের মোঘল রাজপ্রতিনিধিকে প্রদান করতেন। এ "কার্পাস শুল্ক" কোন করদরাজ্যের কর ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. এ এম সিরাজুদ্দিনও একই মত ব্যক্ত করেন।

ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো আরো লিখেছেন যে, "১৭৬০ সালে নবাব মীর কাশিমের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তির দ্বারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রামের দেওয়ানি লাভ করে। কিন্তু এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখ নাই। এমনকি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের প্রথম 'চীফ' হ্যারি ভেরেলস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব দাবি করেননি। ...রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্বর অঞ্চল মনে করা হয়। ...চাকমা রাজ্যের দেওয়ান রনু খান এই বিস্তৃত ভূখন্ডের রাজস্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। ইংরেজ সরকার এই ভূখন্ডের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পর্যায়ক্রমে দখল করতে আরম্ভ করে। এক সময়ে তারা সমগ্র রাঙ্গুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব দাবি করে। ...দেওয়ান রনু খান শাসনকেন্দ্র ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আত্মনিয়োগ করেন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান রাঙ্গুনিয়া অঞ্চল এক সময় জুম্মদের ভূখন্ড ছিল। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো-এর মতে, রাঙ্গুনিয়ার চাকমা প্রশাসক দেওয়ান রনু খানকে উৎখাত করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৎস্থলে দুর্গারাম চৌধুরী নামে একজন সমতলবাসী বাঙালিকে রাঙ্গুনিয়ার চাকলাদার নিযুক্ত করা হয়। এভাবে একপর্যায়ে এই রাঙ্গুনিয়া অঞ্চল সমতল চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত করা হয়। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো আরো লিখেছেন যে, "বুকাননের বিবরণানুসারে রাঙ্গুনিয়াতে প্রচুর বাঙালি বসবাস করতো। শিলক উপত্যকায় বাঙালিদের বসতি সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। হাচিনসন-এর মতে, সমতলবাসী বাঙালিরা ধান্যজমি চাষাবাদে দিন মজুর হিসেবে কাজ করতো। চাকমা রাজ কর্তৃপক্ষ সমতল অঞ্চলের লোকদের চাকমা ভূখন্ডে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হতেন। এ প্রসঙ্গে মি: হান্টার লিখছেন, রাজা ধরম বক্স খাঁ কিছু বাঙালি এনে রাঙ্গামাটি বিলে তাদেরকে বসতি প্রদান করে।" এ থেকে বুঝা যায়, জুম্মরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম অধিবাসী এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রাক্কালে বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করতে থাকে। কিন্তু ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের ভাষায় চার হাজার বছর আগে থেকে বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে এমন কোন দাবির পক্ষে ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে না।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন যে, "বর্তমানে যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আছেন তারা ইদানীং নিজেদের আদিবাসী বলে দাবী করেন...। আদিবাসী হচ্ছে ...ফ্রান্স ও স্পেন এর বাসকু, ...জাপানের আইনু, আরব বেদুইন সম্প্রদায় ইত্যাদি যারা সংশ্লিষ্ট ভূখন্ডে আদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে।" আদিবাসী হিসেবে পরিচিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কেবল 'আদিকাল থেকে বসবাস' করার শর্ত এখানে বিচার্য নয়। তার সাথে সেসব জাতিগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী থেকে পার্থক্য; সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিস্পত্তিকরণ; ভূমির সাথে নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিবেচ্য। জাপানে কেবল আইনুরা আদিকাল থেকে বসবাস করছে না, মূল জাপানি জনগোষ্ঠীও আদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে। আরবে কেবল বেদুইনরা আদিকাল থেকে বসবাস করছে না, তার সাথে সংখ্যাগুরু আরব জনগোষ্ঠীও আদিকাল বসবাস করে আসছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আদিবাসী সংজ্ঞা অনুসারে সংখ্যাগুরু জাপানি ও আরবিরা আদিকাল থেকে বসবাস করলেও তারা আদিবাসী বর্গের মধ্যে পড়ে না। কেননা তারা আদিবাসীদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো পরিপূরণ করে না। আর আইনু বা বেদুইনদেরকে আদিবাসী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুরু জাপানি ও আরবিরা বহিরাগত হয় না এই বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

অনেকের একটা ধারণা হচ্ছে, আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করলে তাদেরকে অধিকতর অধিকার দিতে হবে। আর উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিসত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করলে তাদেরকে কম অধিকার দিয়েই পার পাওয়া যাবে এমন আহমকের ধারণা

রয়েছে। দেশে দেশে এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিসত্তা, সনাতনী সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী, জনজাতি যেই নামেই অভিহিত করা হোক না কেন আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা ও মানবাধিকার আইন অনুসারে তারা সবাই আদিবাসী বর্গের মধ্যে পড়ে। আর সেসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে দেশে দেশে যেই নামে অভিহিত করা হোক না কেন অধিকার উপভোগের বেলায় কোন তারতম্য করা যাবে না। অর্থাৎ আদিবাসীরা যে অধিকার উপভোগের অধিকারী, উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও সেই অধিকার প্রাপ্য। আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিসত্তা যেই নামে অভিহিত করা হোক না কেন তাদেরকে একই মাপের অধিকার দিতে হবে। প্রত্যেক জাতি বা জাতিগোষ্ঠীর তার আত্মপরিচিতির অধিকার রয়েছে। যারা অন্য জাতির এই আত্মপরিচিতির অধিকারকে স্বীকার করে না তারা অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, প্রগতি বিরোধী ও চরম জাত্যাভিমানী।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর এক লেখায় (কারও মনে দু:খ দিয়ো না..., প্রথম আলো, ৯ আগষ্ট ২০১১) লিখেছেন যে, "আদিবাসী বির্তক শুরু হওয়ার পর আমি খবরের কাগজে দেখেছি, ...সেনাবাহিনীর যেসব সদস্য আদিবাসীদের সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তাদের যেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে না দেওয়া হয়। ...এখন যদি আদিবাসীর ওপর অত্যাচার করাটা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার সবচেয়ে সহজ সমাধান হবে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া, এই দেশে আদিবাসী বলেই কিছু নেই। যদি আদিবাসী না থাকে, তাহলে তাদের ওপর অত্যাচারটা করার প্রশ্নই তখন থাকবে না। অত্যন্ত জটিল একটা সমস্যার এর থেকে সহজ সমাধান আর কী হতে পারে?" এ ধরনের উদ্ভট কল্পনা ও ধারণা থেকে আদিবাসী বিষয়ে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের মতো লোকদের এমন অবস্থান বলে প্রতীয়মান হয়।

খ. দেশ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধে জুম্মদের ভূমিকা:

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন যে, "কালের পরিক্রমায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা দুই বার বড় ধরনের ভুল করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময় তারা ভারতের অংশ হবার চেষ্টা করে...। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় এবং বোমাং রাজা মংশৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করে রাজাকার এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।" তিনি আরো বলেছেন যে, "মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষেই অস্ত্র ধরলো বেশীর ভাগ পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং হত্যা করলো ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদেরসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের। এখন দেশে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য রাজাকারদের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই অপরাধে তারা অপরাধী কিনা সময়ই তা বলে দিবে।"

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি আইন অনুসারে পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার জুম্মদের দাবিকে তিনি কোন অর্থে ভুল হিসেবে অভিহিত করেছেন তা স্পষ্ট নয়। মুসলিম অধুষিত অঞ্চলগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান এবং অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে নিয়ে ভারত গঠনের বিধান ছিল। আর রাজ্যশাসিত অঞ্চলগুলো তারা ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে কিংবা তারা স্বাধীন থাকতে পারবে বলে উক্ত আইনে উল্লেখ ছিল। দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ৬৩৫টি রাজ্যশাসিত অঞ্চল ছিল। তৎসময়ে যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার ৯৭.৫% অমুসলিম, স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা ভারতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছিল, তাতে কোন অন্যায্যতা ছিল বলে বলা যায় না। বরঞ্চ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার কিছু দিন যেতে না যেতেই তার অসারতা প্রমাণিত হতে থাকে তা আজ নতুন করে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে ব্যক্তি ত্রিদিব রায় বা ব্যক্তি মংশৈ প্রু চৌধুরীর অংশ নেয়ার সাথে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর ভাষায় 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'গুলোকে জাতিগতভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন। ব্যক্তি ত্রিদিব রায় বা ব্যক্তি মংশৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষে নিয়েছেন বলে জাতিগতভাবে জুম্মরা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছেন এমনটা অভিযোগ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না; যেমনটা যুক্তিগ্রাহ্য হবে না যে, বাঙালি বংশোদ্ভূত জামাত-শিবিরের লোকেরা রাজাকারের ভূমিকা নিয়েছেন বলে বেশির ভাগ বাঙালির বিরুদ্ধে রাজাকারের অভিযোগ আনা। পাকবাহিনীর পক্ষে অসংখ্য বাঙালি অবস্থান নিয়েছিল, রাজাকার-আলবদর-আলশামস্ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু তাই বলে তো গোটা বাঙালি জাতি তার জন্য দায়ী হতে পারে না।

জনসংহতি সমিতির প্রকাশিত 'জুম্ম সংবাদ বুলেটিন'-এ বলা হয়েছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও ছাত্র-যুবকদের রাইফেল প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সেই প্রশিক্ষণে অনেক জুম্ম ছাত্র-যুবকও অংশগ্রহণ করে। জানা যায় যে, তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও বর্তমানে আওয়ামীলীগের অন্যতম নেতা হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম) ও আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা সাইদুর রহমানের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় জুম্ম ও বাঙালি ছাত্র-যুবকদের মধ্যে কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণে বাঙালি ছাত্র-যুবকদের আসল রাইফেল দেয়া হলেও জুম্ম ছাত্র-যুবকদের দেয়া হতো শুধু ডামি রাইফেলগুলো।

জানা যায় যে, সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে জুম্ম ছাত্র-যুবকরাও আন্দোলনে যোগ দিতে সংগঠিত হতে থাকে। তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জুম্ম ছাত্র-যুবকদেরও উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী কোকনদাক্ষ রায়ও (রাজা ত্রিদিব রায়ের কাকা) মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিলেন। এ সময় কয়েকশ' জুম্ম ছাত্র-যুবকও মুক্তিযুদ্ধে যোগ

দিতে ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় তারা অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এইচ টি ইমামের প্ররোচনায় জুম্ম ছাত্র-যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় কোকনদাক্ষ রায়কেও কোন অজুহাত ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়। ফলে অনেক জুম্ম ছাত্র-যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত আসে।

মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন মং সার্কেলের তৎকালীন রাজা মং প্রু সাইন যা ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে অনেকটা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেবল মং প্রু সাইন নন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা ভারতে পলায়নরত হিন্দু-মুসলিম বাঙালিদেরকে নিরাপদে ভারতে পৌছতে সাহায্য করেছিল। এমনকি জীবনের ঝুকি নিয়েও অনেক জুম্ম তাদের ঘরবাড়িতে হিন্দু-মুসলিমদেরকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। অনেক জুম্ম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। জীবন বাজি রেখে সম্মুখ সমরে তারা যুদ্ধ করেছিল। অনেক জুম্ম শহীদও হয়েছে।

প্রাক্তন সচিব ও রাষ্ট্রদূত শরদিন্দু শেখর চাকমা তাঁর রচিত 'মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম' ও 'জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়' দু'টি বইয়ে লিখেছেন যে, তৎসময়ে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল (ইপিআর) বাহিনীতে অনেক জুম্ম ছিল। তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে রমণী রঞ্জন চাকমা রামগড় সেক্টরে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিহত হন। সিপাহি হেমরঞ্জন চাকমা বগুড়া সেক্টরে নিখোঁজ হন। তার লাশও পাওয়া যায়নি। সিপাহি অ্যামি মারমাও বগুড়া সেক্টরে যুদ্ধে শাহদাৎ বরণ করেন। বান্দরবানের অধিবাসী তৎকালীন ইপিআরের রাইফেলম্যান উখ্য সিং মারমা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অসম সাহসিকতার জন্য যুদ্ধের পরে তাঁকে বীরবিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান পুলিশবাহিনীতে অনেক জুম্ম চাকরিরত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম বিমলেশ্বর দেওয়ান ও ত্রিপুরা কান্তি চাকমাসহ ২০/২২ জন জুম্ম সিভিল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বরেন ত্রিপুরা, কৃপাসুখ চাকমা, আনন্দ বাঁশী চাকমা ছিলেন অন্যতম।

শরদিন্দু শেখর চাকমা আরো লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর বাহিনী ও ইপিআর বাহিনী নিয়ে রাঙ্গামাটি হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর বাহিনীসহ তিনি রাঙ্গামাটি পৌছলে জুম্ম জনগণই তাদেরকে খাদ্য ও অন্যান্য রসদ যুগিয়েছিল। রাঙ্গামাটি জেলার বন্দুকভাঙ্গায় যেখানে বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের সমাধিক্ষেত্র রয়েছে সেখানে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধের পর মেজর জিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে জুম্মদের গ্রামের ভেতর দিয়ে নানিয়ারচর, মহালছড়ি ও খাগড়াছড়ি হয়ে রামগড় সীমান্তে চলে যান। সে সময় গ্রামে গ্রামে জুম্ম গ্রামবাসীরা মেজর জিয়ার বাহিনীকে খাদ্যসহ নানাভাবে সহায়তা করেছিল। কথিত আছে, খাগড়াছড়ি জেলার কমলছড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে চেঙ্গী নদী পার হওয়ার সময় নদীতে হাঁটু পানি থাকায় যাতে জুতা ও প্যান্ট ভিজে নষ্ট না হয় সেজন্য কমলছড়ি গ্রামের জনৈক মৃগাঙ্গ চাকমা মেজর জিয়াউর রহমানকে পিঠে তুলে নদী পার করে দেন। এভাবে মেজর জিয়া বাহিনীকে সহায়তা দেয়ার জন্য পাকবাহিনী মহালছড়ির সভ্য মহাজন, গৌরাঙ্গ দেওয়ান ও চিত্তরঞ্জন কার্বারীকে ধরে নিয়ে যায়। পাকবাহিনী তাদেরকে আর ফেরত দেয়নি। তাদের লাশও পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, এজন্য অনেক জুম্ম নারী বিভিন্ন জায়গায় পাক সেনা সদস্যের ধর্ষণেরও শিকার হয়। পাক বাহিনীর এসব দমন-পীড়নের কথা ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের প্রবন্ধে কোথাও উল্লেখ নেই। মং সার্কেলের রাজা মং প্রু সাইনের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেও মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক জুম্ম জনগণের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা তিনি অত্যন্ত সুচতুরভাবে এড়িয়ে গেছেন। বরঞ্চ তিনি 'বেশির ভাগ পাহাড়ী নৃগোষ্ঠী'র বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনার চেষ্টা করেছেন।

আরো উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযুদ্ধে জুম্ম জনগণের ভূমিকা নিয়ে একটি কায়েমী স্বার্থবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে থাকে। প্রচার করা হয় যে, জুম্ম জনগণ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। তারা পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিল, তারা পাকিস্তানপন্থী ছিল ইত্যাদি একপেশে তথ্য প্রচারে তৎপর ছিল এবং বলাবাহুল্য তারা এখনো সক্রিয় রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর জুম্ম জনগণকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল পাকিস্তান বিরোধী বা ভারতপন্থী বলে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই তাদেরকে বলা হলো পাকিস্তান পন্থী। এভাবেই ইতিহাসের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে জুম্ম জনগণকে মনগড়া অভিধায় আখ্যায়িত করে জুম্ম জনগণের উপর বঞ্চনা ও পীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই খাগড়াছড়ির পানছড়ি ও দীঘিনালায় জুম্মদের উপর চালানো হয় নৃশংস হত্যাকান্ড। শরদিন্দু শেখর চাকমা তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগত একদল মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পানছড়িতে সমবেত হওয়া জুম্মদের উপর হামলা চালিয়ে ১৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির কুকিছড়া এলাকায় আরো ২২ জনকে ও দীঘিনালায় ১৮ জনকে হত্যা করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিনে খাগড়াছড়ি বাঙ্গালকাটি গ্রামে হত্যা করা হয় ৯ জন জুম্ম গ্রামবাসীকে। জ্বালিয়ে দেয়া হয় অনেক ঘরবাড়ী ও বহু নারীর উপর করা হয় অত্যাচার। আটক করা হয় খাগড়াছড়ির অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। এভাবেই জুম্ম জাতি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

গ. জুম্মদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিহ্নিতকরণের অপচেষ্টা:

বিশ্বের দেশে দেশে শাসকগোষ্ঠীরা নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে অভিহিত করে জনমতকে বিভ্রান্ত করা এবং আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির

অপচেষ্টা করে আসছে। এদেশের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা ও ১১ দফা আন্দোলনকে তৎকালীন পাকিস্তানী জান্তা সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে অপপ্রচার চালিয়েছিল। সত্তর দশকে শুরু হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকেও দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করার বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর অপচেষ্টারও কোন কমতি ছিল না। ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের লেখায়ও তার প্রচ্ছন্ন প্রতিফলন ঘটেছে। তারই অংশ হিসেবে তাঁর প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছিল অসংখ্য নিরীহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বাঙালী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের।"

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও আশা করেছিল যে, তাদের উপর চলমান সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনারও অবসান হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত সদ্য স্বাধীন দেশে তারা তাদের হৃত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার ফিরে পাবে এমনটা আশা করেছিল। তারই আলোকে ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারসহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান থেকে শুরু করে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, মন্ত্রীসভার সদস্য, দেশের রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সকলের কাছে এম এন লারমা ধর্ণা দিয়েছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু জুম্ম জনগণের সেই দাবি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করে। দাবি পূরণের পরিবর্তে সরকার দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করে। জুম্ম জনগণের সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালায়।

১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন জুম্ম জনগণের সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ লাভ করে। এ সময় নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে জুম্মদের চিরতরে নিশ্চিহ্নকরণের লক্ষ্যে বহিরাগত সেটেলারদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উপর একের পর কমপক্ষে ১৪টি গণহত্যা সংঘটিত হয়। এসব গণহত্যায় শিশু ও নারীসহ শত শত মানুষ নৃশংসভাবে নিহত হয়। গ্রামের পর গ্রাম ভস্মিভূত হয়। হাজার হাজার মানুষ নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। জুম্মরা দফায় দফায় ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ জুম্মদের বিরুদ্ধে সেসব মধ্যযুগীয় বর্বরতা বিষয়ে কোন কিছু তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেননি। সরকারের এ ধরনের বর্বরতা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি সংলাপের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পথ বরাবরই উন্মুক্ত রেখেছিল। জনসংহতি সমিতি একদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকে; অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপও চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করলেও চুক্তি বাস্তবায়নে বরাবরই তালবাহানা করতে থাকে। ফলে জুম্ম জনগণ বর্তমানে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের প্রবন্ধে "বিত্তহীন নিরীহ মানুষদের হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, ফসল ধ্বংস, বাগান ধ্বংস, জ্বালাও-পোড়াও, ভয়ভীতি এবং নির্যাতন... স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, আদেশ নির্দেশ ও মীমাংসা না মানার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করছে যা সংবিধান বিরোধী এবং দেশদ্রোহীতার নামান্তর" বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে গড়িমসি এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। এমনকি চুক্তি পরবর্তী সময়ে সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা, বহিরাগত ভূমিদুস্যদের ভূমি বেদখল ও ভূমি থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলা, সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুদের ধর্ষণ, হত্যা ও অপহরণের মতো বর্বরোচিত সহিংসতা, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি ছিলেন একেবারেই নীরব ও নির্লিপ্ত।

ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রসঙ্গেঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে উপনীত হওয়ার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, যিনি বর্তমানেও প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন। অথচ সেই চুক্তিকে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "শান্তিচুক্তির কিছু ধারা আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।" তাহলে তিনি কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও সংবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করছেন? তৎকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য, দেশের আইনজ্ঞ ও প্রথিতযশা সংবিধান বিশেষজ্ঞ যাদের চুলছেড়া বিশ্লেষণে এই চুক্তির ধারা-উপধারা পরীক্ষা করে স্বাক্ষর করা হয়েছিল তারা সবাই কি বোকা ছিলেন?

এমনকি ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ এমনও বলেছেন যে, "চুক্তি অনুযায়ী নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক ক্যাম্প ইতোমধ্যে বন্ধ

করা হয়েছে অথচ সন্ত্রাসীরা তাদের সকল অস্ত্র এখনও পর্যন্ত সমর্পন করেনি।" সরাসরি নাম উচ্চারণ না করলেও 'সন্ত্রাসী' বলতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াকু রাজনৈতিক দলকেই ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ বুঝাতে চেয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ চুক্তি অনুযায়ী একমাত্র জনসংহতি সমিতিই অস্ত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, চুক্তি মোতাবেক চার দফায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা। জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার হীন উদ্দেশ্যেই তিনি এ ধরনের মিথ্যাচার ও অসত্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন বলে নি:সন্দেহে বলা যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছিল। চুক্তির বাস্তবায়িত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন; আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন; ভারত থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন; চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, ভূমি কমিশন ও টাস্কফোর্স গঠন; পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে ৬৬টি ক্যাম্প প্রত্যাহার; তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কতিপয় বিষয় বা কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি।

কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত, ভূমি ও অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত, 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত জাতীয় ও বিশেষ আইনগুলোর সংশোধন ইত্যাদি চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা সরকারের গাণিতিক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ চর্বিত চর্বন করেছেন যে, "শান্তিচুক্তির সর্বমোট ৭২ টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারার বেশীর ভাগ অংশ এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।" তিনি আরো বলেছেন যে, "একটি অর্ধেক পানি ভর্তি গ্লাসকে অর্ধেক পূর্ণ বা অর্ধেক খালি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।" কিন্তু তিনি কোনটা অর্ধেক পূর্ণ বা কোনটা অর্ধেক খালি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। বস্তুত চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি গাণিতিক পরিসংখ্যান দিয়ে পরিমাপ করার বিষয় নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি দেখতে হবে রাজনৈতিক ও বিষয়গত সামগ্রিকতার আলোকে। এছাড়া চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের এই পরিসংখ্যানেও রয়েছে শুভঙ্করের ফাঁকি।

উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ধারাগুলোর বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের দাবি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ভূমি কমিশন গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক এ সমস্যা সমাধানে চুক্তির 'ঘ' খন্ডের তিনটি ধারায়– যথাক্রমে ৪, ৫ ও ৬ নং ধারায় বিধান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দাবি করছে, এই তিনটি ধারার মধ্যে ৫নং ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত এবং অবশিষ্ট ৪ ও ৬নং ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮)। কিন্তু বাস্তবে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ এগিয়ে গেছে? তার উত্তর নি:সন্দেহে নেতিবাচক ও হতাশাব্যাঞ্জক। বিগত ১৮ বছরে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি একবিন্দুও এগুতে পারেনি। এভাবে খন্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে গাণিতিক পরিসংখ্যান দিয়ে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে একধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি দেয়া হচ্ছে ও দেশবাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক এ সমস্যা নিরসনে প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। আইনের এসব বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে একবার এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ২০১১ সালে একবার এবং সম্প্রতি ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আরেকবার ঐক্যমত্য হলেও তদনুসারে আইনটি এখনো সংশোধিত হয়নি। এসব বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না হওয়ায় এখনো ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করতে পারেনি। অথচ ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ মনগড়া ও বানোয়াট বক্তব্য দিয়ে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "এখানকার সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো ভূমি সমস্যা সমাধান কার্যক্রমে সর্বদা বাধা প্রদান করে থাকে, কারণ ভূমি সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে তাদের হাতে কোন ইস্যু থাকবে না যা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ট্রাম কার্ড।" চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের গড়িমসি ও ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিয়ে জুম্মদের উপর চাপিয়ে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে তিনি এভাবে মনগড়া ও বিকৃত বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন বলে বলা যেতে পারে।

জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যর্পণের পরিবর্তে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল ও তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে পদদলিত করে জুম্মদের মৌজা ও জুম ভূমির উপর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে শত শত একর ভূমি ইজারা প্রদান করে এবং পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা করে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অথচ ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে জুম্মদের এই প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে হেয় করে লিখেছেন যে,

"আর একটি জটিলতা হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের ভূমির মালিকানার যথাযথ কাগজপত্র না থাকা। কারণ অতীতে তারা কোন প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকেই জমি ভোগদখল করতো।" তাঁর এই বক্তব্য থেকে জুম্ম জনগোষ্ঠী বা তাঁর ভাষায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও অধিকার সম্পর্কে চরম অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আদিবাসীদের চিরাচরিত ভূমি অধিকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূমির উপর তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মালিকানা। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থপনায় এই সম্পদ এলাকাবাসী একাধারে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে ভোগদখল করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার আইএলও'র ১০৭নং কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জুম্মদের সেই প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনগুলোতেও সেই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

ঙ. পৃথক জুম্মল্যান্ড সম্পর্কে অলীক কল্পনা ও অপপ্রচার:

দেশবাসীর মধ্যে জুম্ম জনগণ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা, সর্বোপরি জুম্মদের উপর চলমান বঞ্চনা ও দমন-পীড়ন জায়েস করার হীন উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীসহ শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী মহল জুম্মল্যান্ড গঠনের কল্পকাহিনী প্রচারণার কাজ জোরদার করেছে। তারই অংশ হিসেবে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদও তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "পার্বত্য সন্ত্রাসীদের তৃতীয় দিবা কিংবা অলীক স্বপ্ন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসিত প্রকারান্তরে স্বাধীন একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করা যার নাম হবে 'জম্মুল্যান্ড'।" জুম্ম জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এ যাবৎ কখনো কোথাও পৃথক জুম্মল্যান্ড বা স্বাধীন একটি দেশ গঠনের দাবি উত্থাপন করেনি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্ম জনগণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর কাছে চারদফা সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আশি ও নব্বই দশকে এরশাদ ও খালেদা জিয়া সরকারের কাছে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) কাছে আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে। এসব দাবিনামায় দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতাকে অস্বীকার করে কোথাও স্বাধীন দেশ বা পৃথক জুম্মল্যান্ড গঠনের দাবি ছিল না। বরঞ্চ দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার অধীনে সমস্যা সমাধানের দাবি করা হয়েছিল এবং তদনুসারে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাহলে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ কোথায় ও কিভাবে জুম্ম জনগণের "স্বাধীন দেশ বা পৃথক জুম্মল্যান্ড গঠনের" গন্ধ পেয়ে থাকেন? তাদের মধ্যে বিদ্যমান এক ধরনের সন্দেহ বাতিক রোগই এ ধরনের কল্পকাহিনীর মূল উৎস বলে বিবেচনা করা যায়।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ পৃথক জুম্মল্যান্ড বা স্বাধীন একটি দেশ গঠনের সাথে স্বায়ত্তশাসনকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন বলে বলা যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার অধীনে জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অঞ্চলগত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। জনগণই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস - এই গণতান্ত্রিক মূলস্তম্ভের আলোকে দেশের শাসনব্যবস্থা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা তথা নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার নীতি থেকে দেশে দেশে স্থানীয় সরকার, স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি নামে স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে বা হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উক্ত স্বায়ত্তশাসন, স্বশাসন বা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থারই একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ঐতিহাসিক কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক শাসনব্যবস্থা জারি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে আরো গণতান্ত্রিক, যুগোপযোগী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের অঞ্চলগত (টেরিটোরিয়েল) মন্ত্রণালয়েরও বিধান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীরা যাতে তাদের উন্নয়ন তারাই নির্ধারণ করতে পারে তার অংশ হিসেবে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ থেকে শুরু করে উন্নয়নের সকল বিভাগগুলো এসব প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার বিধান করা হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের সীমিত স্বায়ত্তশাসন বা বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করার বিধান করা হয়েছে। ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ কি আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থার "স্বপ্ন পূরণ হবে না, হতে পারে না" বলে প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছিলেন বলে বলা যেতে পারে। এটা তাঁর চুক্তি বিরোধী মানসিকতা বা জনগণের ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানের উন্মোচন ঘটিয়েছেন বলে বলা যেতে পারে।

চ. শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে বাধা:

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক দল ....এর প্রথম স্বপ্ন সম্ভবতঃ এই এলাকার পশ্চাৎপদ মানুষদের মূর্খ করে রাখা। রাঙ্গামাটিতে মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বাধা প্রদান তার প্রমাণ।" পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রসারে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে জনসংহতি সমিতি এবং সমিতির নেতৃবৃন্দের। তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত জুম্ম ছাত্র সম্মেলনে জুম্ম ছাত্র সমাজকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে গিয়ে জুম্ম সমাজের শিক্ষা বিস্তারসহ জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

সম্মেলনে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষিত তরুণ সমাজ গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এসব শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে থাকে। তরুণ ছাত্র সমাজের সংঘবদ্ধ কর্মযজ্ঞের ফলে জুম্ম জনগণের মধ্যে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারে ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে।

১৯৬৬ সালে জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক তরুণের নেতৃত্বে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই এসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটানো এবং প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো। পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি'। অন্যদিকে ১৯৫৬ সালে পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এসব সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার মহান কর্মযজ্ঞ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রগতিশীল জুম্ম ছাত্র-তরুণ সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যারা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা কমবেশি সবাই শিক্ষকতা ও শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাই এক সময় জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে 'হেড মাস্টার্স ওয়ার্কস' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সশস্ত্র আন্দোলনের সময়ও জনসংহতি সমিতি গ্রামে-গঞ্জে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বরাবরই প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করে এসেছিল যা হয়তো ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের মতো লোকদের জানা থাকার কথা নয়। জনসংহতি সমিতির সেই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার বেহাল অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবিতে জনসংহতি সমিতি এখনো সোচ্চার রয়েছে।

কিন্তু সেই শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী জনসংহতি সমিতি এবং শিক্ষানুরাগী জুম্ম জনগণ কেন আজ রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তার বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করতে হবে। জনসংহতি সমিতি বা জুম্ম জনগণ কখনোই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ তথা উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। তারা বরাবরই উচ্চ শিক্ষাসহ সর্বস্তরে শিক্ষাপ্রসারের পক্ষে রয়েছে। কিন্তু তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষাকে বেহাল অবস্থায় রেখে, জুম্ম জনগণের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে সরকার কর্তৃক উন্নয়নের নামে রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে নয়।

সরকার এমন এক পরিস্থিতিতে ও বাস্তবতায় রাঙ্গামাটিতে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধান এখনো আশানুরূপভাবে অর্জিত হয়নি। অধিকন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর যোগান দেয়ার মতো পার্বত্যবাসীর অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত ভিত্তি এখনো গড়ে উঠেনি। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা, স্বাতন্ত্র্যতা, জাতিবৈচিত্র্যতা, পশ্চাদপদতা, ভূমি সমস্যা ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। স্বভাবতই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হলে ৯০% এর ক্ষেত্রে বহিরাগতরাই সুযোগ পাবে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী অধিবাসী নয় এমন ব্যক্তির অভিবাসনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে যা এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পার্বত্যবাসীর শিক্ষা প্রসারে অবদান রাখার পরিবর্তে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাদি আরো জটিল করে তুলবে।

বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্রদের দিয়ে ইতিমধ্যে রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ১৭ অক্টোবর ২০১৫ বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্র শামসুজ্জামান বাপ্পির নেতৃত্বে কতিপয় বহিরাগত ও ছাত্রলীগের কর্মীরা যৌথভাবে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে জুম্ম ছাত্রদের উপর এবং কলেজের বাইরে জুম্ম পথচারীদের উপর হামলা করেছে। তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্মস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হলে ভবিষ্যতে পার্বত্যাঞ্চলে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়েই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমানে সার্বক্ষণিক সেনা ও পুলিশ প্রহরাধীনে এসব বিতর্কিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "শিক্ষার হার ১৯৭০ সালে মাত্র ২% শতাংশ ছিল যা বেড়ে এখন ৪৪.৬% হয়েছে।" এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সত্তর দশকের তুলনায় বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক গুণে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই, কিন্তু শিক্ষা প্রসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা আন্দোলন ও আপামর জুম্ম জনগণের শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহই এক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষ করে কাপ্তাই বাঁধের পর জায়গা-জমি হারা জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষালাভের আগ্রহ আরো বেশি জোরালো হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার হার (৪৪.৬%) জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার হার (৫৭.৫৩%) থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

মোহাম্মদ রফি ও এ মুস্তাক আর চৌধুরী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত এক গবেষণায় চাকমাদের শিক্ষার হার ৩৬.২%, মারমাদের ২৬.৬%, ত্রিপুরাদের ১৮.৫% এবং সবচেয়ে কম ম্রোদের মধ্যে তা হলো ২.৯%।[৩] এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে net enrollment-এর হার হলো ৫৬%, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে হলো ৭৭.১%। ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ সেসব তথ্য অত্যন্ত সুচতুরভাবে এড়িয়ে গেছেন।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ আরো বলেছেন, "সেসব নেতানেত্রীদের সন্তানেরা ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়া করলেও তারা চান সাধারণ জনগণের সন্তানেরা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা শিখে এবং বাংলা ও ইংরেজী না শিখে জংগলের আরও গভীরে চলে যাক।" জনসংহতি সমিতি বা জুম্ম জনগণ কখনোই বলে নাই 'শুধুমাত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা'য় শিখতে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠদান এবং একটি মাতৃভাষা বিষয় চালু করার দাবি উঠে এসেছে। বহুভাষিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো- 'স্বভাষা আগে' (first language first) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে শিশু শিক্ষার হাতেখড়ি হয় প্রথমে নিজের মাতৃভাষায়, যা পরে দ্বিতীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাষা ও তৃতীয় বা আন্তর্জাতিক ভাষার সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বহুভাষিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাসরত প্রভাবহীন বা অবহেলিত ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের বেলায় এই শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজের জানা জগত থেকে ধীরে ধীরে অজানা জগত সংক্রান্ত তথ্য বা জ্ঞান লাভ করে।[৪] এই শিক্ষা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে জনাব তোফায়েল আহমেদ মাতৃভাষায় শিক্ষাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। রক্তপিচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী একটি দেশের কর্মরত কর্মকর্তা থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষা বিরোধী বক্তব্য কখনোই আশা করা যায় না।

ছ. করণীয় সম্পর্কে:

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে অনেক সুপারিশ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো– (ক) নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের নিশ্চিত করতে হবে; (খ) চাঁদা প্রদান বন্ধ করতে হবে; (গ) টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে; (ঘ) শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি বিষয়ে বেশ সরব ভূমিকায় দেখা যায়। যদিও চাঁদাবাজি তথা সন্ত্রাস দমনে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপর দায়িত্ব বর্তায় এবং স্বাভাবিকভাবে চাঁদাবাজি বন্ধের ব্যর্থতার দায়ও তাদের উপর বর্তায়। চাঁদাবাজি যেই করুক না কেন তার বিরুদ্ধে অবশ্যই একাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে তার কোন ব্যত্যয় হতে পারে না। কিন্তু ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের এই চাঁদাবাজির অভিযোগের তীর কেবল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির দিকে। তিনি ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজি, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। শিক্ষক নিয়োগে ক্ষমতাসীন দলের লক্ষ-কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতি, ছাত্র-যুবলীগের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, বনজ সম্পদের উপর প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি বাহিনীর চাঁদাবাজি বিষয়ে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেননি। এ থেকে বুঝা যায়, তার মূল উদ্দেশ্যই হলো জুম্মদেরকে চাঁদাবাজ হিসেবে চিহ্নিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে পরিমাণে চাঁদাবাজি হয়ে থাকে, তার থেকে হাজারগুণ হয়ে থাকে ক্ষমতাসীনদের ঘুষ-দুর্নীতি, অনিয়ম, টেন্ডারবাজি, বনজ দ্রব্যের উপর অবৈধ টোলবাজির মাধ্যমে অর্থ লুটপাট ও আত্মসাৎ।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ টেকসই উন্নয়নের পক্ষে ওকালতি করলেও কিভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টভাবে কোন দিক নির্দেশনা দেননি। তিনি শিক্ষা বিস্তার, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প, কৃষি, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির সুপারিশ করেছেন। বাংলাদেশে জাতি-ভিত্তিক পৃথক কোন সরকারি তথ্য বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে বেসরকারি অনেক গবেষণায় বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে তুলনামূলকভাবে জুম্মদের অধিকতর দারিদ্রতার চিত্র উঠে এসেছে। বাংলাদেশে প্রকৃত দারিদ্রতার হার ৪০% এর বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার ৫৮% আর জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬২%। তন্মধ্যে স্বল্প জনসংখ্যা ও অধিকতর সুবিধা-বঞ্চিত লুসাই ও বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার ৯০% এবং চাক, খিয়াং ও পাংখু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮০%।[৫] দেশে দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এসব জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন তথা পাহাড়-পর্বতময় দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের কি ধরনের উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করলে সেই উন্নয়ন টেকসই হবে কিংবা জুম্মদের সংস্কৃতি ও বিশেষ প্রেক্ষাপটগুলো কিভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় সে সম্পর্কে ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। বর্তমান বিশ্বে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জাতিগত পরিচিতি ও জীবনধারা অটুট রেখে পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন মডেলকে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে উন্নয়ন জনমানুষের সংস্কৃতি, জাতিসত্তা ও জীবনযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে সেই ধরনের উন্নয়ন কখনোই টেকসই হতে পারে না।

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন

৩ Counting the Hills, Assessing Development in Chittagong Hill Tracts, edited Mohammad Rafi and A Mushtaque R. Chowdhury, UPL, 2001

৪ দেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে চাই, আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, কাপেং ফাউন্ডেশন, ২০১৫

৫ Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts, Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF), UNDP, 8 April 2009

পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হলেও এখনো পূর্বের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। তাই তো আজ পর্যটনের নামে, রাবার চাষের জন্য বহিরাগতদের নিকট হাজার হাজার একর জমি ইজারা দেয়ার নামে, মৌজা ও জুমভূমিগুলো রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে, বিজিবি ক্যাম্পের নামে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমি হুকুম দখল করে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। যে উন্নয়ন মানুষের জীবনযাত্রাকে পঙ্গু করে এবং ভিটেমাটি থেকে বিতাড়ন করে সেই ধরনের উন্নয়ন কখনোই টেকসই হতে পারে না। সেই ধরনের উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া জুম্ম-স্বার্থ বিরোধী উন্নয়নের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জাতীয় নেতৃত্ব বরাবরই বিরোধিতা করে আসছে। আর ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের মতো লোকেরাই জুম্মদের সেই ন্যায্য আন্দোলনকে উন্নয়ন বিরোধী হিসেবে অপপ্রচার চালানোর অপচেষ্টা করছেন।

আর সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় জুম্মদের জায়গা-জমি দখল করে, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে, সর্বোপরি নারী ও শিশুর উপর ধর্ষণ, হত্যা ও অপহরণের মতো বর্বরতা চালিয়ে যদি 'শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করার' বয়ান দেয়া হয় তাহলে সেটা কেমন ধরনের সম্প্রীতি হবে তা বলাই বাহুল্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের ১৮টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এসব হামলায় জুম্মদের শত শত ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে। ২০১০ সালে সংঘটিত বাঘাইহাট হামলায় সরকারি বাহিনীর গুলিতে একজন নারীসহ দুইজন নিরীহ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এসব হামলায় জড়িত কোন ব্যক্তিকেই যদি বিচারের আওতায় আনা না হয় এবং তারপর যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আওয়াজ তোলা হয় তাহলে সেটা কত বড় ধোকাবাজি ও দুর্বৃত্তায়ন তা বলাই বাহুল্য।

জ. উপসংহার:

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া। অথচ ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ তাঁর এতবড় প্রবন্ধে কোথাও চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে টু শব্দটিও করেননি। তাঁর প্রবন্ধের আগাগোড়ায় অতি সুক্ষ্মভাবে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধেই যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, "এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে পৃথবীর অনেক দেশে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবার পরও তা নানান কারণে কার্যকর করা যায়নি বা সম্ভব হয়নি।" এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি চুক্তি বাস্তবায়ন না করার পক্ষেই সাফাই গেয়েছেন তা নি:সন্দেহে উদ্বেগজনক বলা যায়। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা এমন কর্তা ব্যক্তিরা যদি 'উত্তম উদাহরণ' এর পরিবর্তে 'অধম উদাহরণ' এর সাথে তুলনা করে দেশের অবস্থানকে তুলে ধরতে চান তাহলে তা একাধারে কতটা ভয়ংকর ও লজ্জাজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চুক্তি স্বাক্ষর করে বাস্তবায়ন না করার প্রতারণামূলক ধারার সাথে তারা দেশকে যুক্ত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন এ থেকে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে।

ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদের প্রবন্ধের আরেকটা সুক্ষ্ম উদ্দেশ্য হলো জুম্মদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো। জুম্মদের সংস্কৃতি ও পরিচিতি, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কিংবা তাদের উপর যুগ যুগ ধরে চলমান বৈষম্য-বঞ্চনা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি কোন বাক্যই ব্যয় করেননি। তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে এমনভাবে প্রবন্ধের বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন যেখানে জুম্মদেরকে সন্ত্রাসী, উন্নয়ন বিরোধী, শিক্ষা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, চাঁদাবাজ, মানুষ হত্যাকারী, অপহরণকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, রাজাকার, পাকিস্তানপন্থী, সংবিধান বিরোধী, দেশদ্রোহী, প্রশাসনের আদেশ-নির্দেশ অমান্যকারী, বহিরাগত, অন্য দেশ থেকে আগত ইত্যাদি এমন কোন আখ্যা নেই তিনি উল্লেখ করেননি। জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় বেতনভোগী রাষ্ট্রের একজন কর্তাব্যক্তির মানসিকতাই যদি এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক, জাত্যাভিমানী, জাতি-বিদ্বেষী, পার্বত্য চুক্তি বিরোধী হয়, তাহলে জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অবস্থা কী হবে বা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কিভাবে এগুবে, সর্বোপরি দেশকে কিভাবে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নেয়া যাবে তা এক চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয় বলা যায়।

আরো উদ্বেগের বিষয় হলো, সেই ধরনের পার্বত্য চুক্তি বিরোধী, উগ্র জাত্যাভিমানী ও জাতি-বিদ্বেষী প্রবন্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থ দেখভালকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনায় প্রকাশিত হওয়া। এ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তিদের চুক্তি বিরোধী, সুবিধাবাদী ও পদলেহনকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা সম্পর্কেও সহজে ধারণা লাভ করা যায় যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও বিপজ্জনক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়নের মতো অসত্য, খন্ডিত ও বিভ্রান্তিমূলক গাণিতিক পরিসংখ্যান তুলে ধরার ক্ষেত্রেও নাটের গুরু হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়ন না করেও মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে 'সম্পূর্ণ' বা 'আংশিক' বাস্তবায়নের দাবি করা হয়েছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে এই মন্ত্রণালয় অতি সুক্ষ্মভাবে ভুল ও মনগড়া তথ্য দিয়ে চলেছে। এমনকি এই মন্ত্রণালয় ভুলভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে পার্বত্য চুক্তিতে গৃহীত বিষয়গুলো ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে পার্বত্য মন্ত্রণালয় অতি সুক্ষ্মভাবে সেই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে একধরনের ভুল বুঝাবুঝি, বিভ্রান্তি ও দূরত্ব তৈরি হচ্ছে বলে নি:সন্দেহে বলা যায়।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিভ্রান্তিকর ভাষণ

বিভ্রান্তিকর ও অসত্য পরিসংখ্যান তুলে না ধরে ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে পেশকৃত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো পরিচিহ্নিত করে বাস্তবায়নের আহ্বান জনসংহতি সমিতির

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের বৈঠকে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য যে, "পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র কি; চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা? না হলে উহার কারণ কি?" - ঊষাতন তালুকদারের তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র যথাযথভাবে তুলে ধরতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে বলে অসত্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়ন না করেও তিনি তাঁর বক্তব্যে 'সম্পূর্ণ' বা 'আংশিক' বাস্তবায়নের দাবি করেছেন যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের মধ্যকার একটি স্বার্থান্বেষী মহল অতি সুক্ষ্মভাবে ভুল ও মনগড়া তথ্য দিয়ে চলেছে। এমনকি তারা ভুলভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে পার্বত্য চুক্তিতে গৃহীত বিষয়গুলো ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠী অতি সুক্ষ্মভাবে সেই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে একধরনের ভুল বুঝাবুঝি, বিভ্রান্তি ও দূরত্ব তৈরি হচ্ছে বলে জনসংহতি সমিতির অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে চুক্তির বেশির ভাগ অংশই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা হলেও জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্যবাসী ও নাগরিক সমাজের মতে চুক্তির মৌলিক বিষয়াদিসহ দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত রয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো পূর্বের মতো নিরাপত্তাহীন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় ভাষণে সেই অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের এক দিক-নির্দেশনা থাকবে বলে জনসংহতি সমিতি আশা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণে কেউই সেই দিক-নির্দেশনা বা আশার আলো খুঁজে পায়নি। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ন্যায় কেবল উন্নয়নের বিবরণই তুলে ধরেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে পূর্বের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন, সর্বোপরি পূর্বের ন্যায় আবারও চুক্তি বাস্তবায়নে তার সরকারের আন্তরিকতার কথা একইভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা শুনতে শুনতে মানুষ একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়নের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়নের বিভ্রান্তিকর ও অনেকাংশে অসত্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, চুক্তির 'ক' খন্ডের যে ৪টি ধারা রয়েছে সেগুলো 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে আপনি দাবি করেছেন। এই ৪টি ধারার মধ্যে ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা ও তা সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু এই বিধান এখনো কাগজ-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কেননা পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোন আইনী বা প্রশাসনিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে নানা কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে বহিরাগতদের অভিবাসন ঘটছে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে বসেছে। অপরদিকে ২নং ধারায় "যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে" মর্মে বিধান রয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধন করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য জাতীয় ও বিশেষ আইনগুলো এখনো অসংশোধিত অবস্থায় রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পুলিশ আইন, বন আইন, স্থানীয় সরকার পরিষদ

(ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা) আইন, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধিবিধান ইত্যাদি সংশোধন করা হয়নি। সুতরাং এসব ধারাগুলো 'সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের মতো পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে যে দাবি করছেন তা শুনে পার্বত্যবাসী আশ্চর্য ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না।

অনুরূপভাবে এই খন্ডের ৩নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে এবং এ বিধান অনুসারে এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি গঠিত হয়ে আসছে। তবে এ কমিটির নিজস্ব কোন কার্যালয়, জনবল ও তহবিল নেই। ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণের কোন ধারাবাহিকতা নেই। পূর্বে এই কমিটির সভায় অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলো কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি অকার্যকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে বলা যায়। চুক্তি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব যার উপর অর্পিত সেই কমিটির সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়িত না হয়, সেই কমিটি যদি সচল ও কার্যকর করা না হয়, তাহলে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ কিভাবে এগুবে তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী 'উক্ত কমিটি চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে' এবং এই ধারা 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে যে দাবি করেছেন তা সত্যের অপলাপ বৈ কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৫টি ধারার মধ্যে ২৬টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত এবং অবশিষ্ট ধারার মধ্যে ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭ ও ৩৪ নং ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের মাধ্যমে উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৯নং ধারা ব্যতীত যদিও 'খ' খন্ডের অন্যান্য সকল ধারা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানেই তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ বছরেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৩৪-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পরিবর্তে এখনো অনির্বাচিত বা সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ দিয়ে এসব তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে আইনের প্রয়োগ নেই, সেখানে এ বিধানগুলো 'সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে দাবি করা কখনোই সঠিক হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে আরো বলা যায় যে, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ৯নং ধারা ও পার্বত্য জেলা পুলিশ গঠন সংক্রান্ত ২৪নং ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হওয়ার দাবি একেবারেই সঠিক নয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের নিমিত্তে ভোটার তালিকা বিধিমালা বা নির্বাচন বিধিমালা যেখানে এখনো প্রণীত হয়নি, সেখানে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি 'আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে দাবি করা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। অনুরূপভাবে পার্বত্য জেলা পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়টির কোন দপ্তর বা জনবল যেখানে এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি, সেখানে তা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়।

ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নে সরকারের খন্ডিত ও অসত্য বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা'। তাই রাজনৈতিক উপায়ে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। একটি রাজনৈতিক চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়কে কখনোই গাণিতিক পরিসংখ্যান দিয়ে বাস্তবায়নের প্রকৃত অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় না। রাজনৈতিক ও বিষয়গত সামগ্রিকতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি দেখতে হবে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। আপনি বলেছেন যে, চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৯টি ধারার মধ্যে ১১টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত ও ৪টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। চুক্তির এই খন্ডে ৪, ৫ ও ৬নং ধারা হচ্ছে ভূমি কমিশন গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত। আপনার ভাষণে ভূমি কমিশন গঠন সংক্রান্ত ৫নং ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত এবং অবশিষ্ট ৪ ও ৬নং ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে আপনি দাবি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে? বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত ভূমি বিরোধের মধ্যে এখনো একটাও নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি বিগত ১৮ বছরে সামগ্রিকভাবে এগুতে পারেনি। এভাবে খন্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে গাণিতিক পরিসংখ্যান দিয়ে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে একধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি দেয়া হচ্ছে ও দেশবাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে।

বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিরসনে প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না করা। জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়নের ফলে যে বিরোধাত্মক ধারাগুলো আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো সংশোধনের জন্য আপনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ২০১১ সালে একবার এবং সম্প্রতি ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আরেকবার ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। সর্বশেষ গত বছরের জানুয়ারি সভায় উক্ত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদের তৎসময়ে চলমান শীতকালীন অধিবেশনে (১৯ জানুয়ারি থেকে ১২ মার্চ ২০১৫) উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় সংসদের সেই সময়ের শীতকালীন অধিবেশনসহ বিগত একবছরে অনেক অধিবেশন শেষ হয়ে গিয়ে বর্তমানে আবার শীতকালীন অধিবেশন চলছে, কিন্তু এই আইনের সংশোধনী বিল এখনো জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়নি। আপনি আপনার ভাষণে উল্লেখ করেছেন, 'উক্ত আইনের

সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে'। এ সরকারের বিগত ৭ বছরের অধিক মেয়াদকালে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একের পর এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে পার্বত্যবাসী আজ চরম হতাশাগ্রস্ত, আশাহীন ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে পার্বত্যবাসী আর প্রতিশ্রুতি শুনতে চায় না, তারা চায় প্রকৃত বাস্তবায়ন ও দৃশ্যমান অগ্রগতি।

অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারে সরকারের স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকালীন সময়ে ২৩২টি সেনা ক্যাম্প থেকে গত ১৭ বছরে অর্ধেকের বেশি সেনা ক্যাম্প কয়েকটি ধাপে প্রত্যাহার করা হয়েছে' বলে উল্লেখ করেছেন, যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ১১৯টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের খবর বেরিয়েছে। জনসংহতি সমিতির কাছে চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে ৩১টি ক্যাম্প এবং বর্তমান মহাজোট সরকার গঠনের পরে ২০০৯ সালে ৩৫টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের তালিকা হস্তগত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একসময় ১৭২টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ইউপিআর অধিবেশনে ২৩৮টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি করা হয়েছিল। এভাবে সরকারের তরফ থেকে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যা দাবি করা হচ্ছে। ক্যাম্প প্রত্যাহারে এই তথ্য বিভ্রাট থেকে এ সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের উদ্রেক করে। আরো উদ্বেগের বিষয় যে, চুক্তির পর 'অপারেশন দাবানল' এর স্থলে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামক আদেশ জারির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে এখনো একধরনের সেনা কর্তৃত্ব বলবৎ রয়েছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদে বিষয়/বিভাগ হস্তান্তরেও শুভঙ্করের ফাঁকি: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে অর্পিত বিষয় হস্তান্তরেও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে অসত্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রথম মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) চুক্তির পূর্বে হস্তান্তরিত বিভাগের অধীন যে ৭টি কর্ম ও প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করা হয়েছে সেগুলোও এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গণ্য করে যথাক্রমে 'খাগড়াছড়ি জেলায় ৩০টি বিভাগ, রাঙ্গামাটি জেলায় ৩০টি এবং বান্দরবান জেলায় ২৮টি বিভাগ জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে' বলে প্রচার করা হচ্ছে যা দেখে দেশবাসী মনে করবে যে, ৩৩টি বিভাগ/কার্যাবলীর মধ্যে প্রায় সবক'টিই হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। বস্তুত: পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধিত) আইন ১৯৮৯ এর প্রথম তফসিলে পরিষদের যে ৩৩টি কার্যাবলীর তালিকা রয়েছে তার মধ্যে এযাবৎ ১৭টি বিভাগ/কার্যাবলী হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি বিভাগ/কার্যাবলী এখনো অহস্তান্তরিত অবস্থায় রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), বন, পরিবেশ, মাতৃভাষায় শিক্ষা, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ইত্যাদি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিধান রয়েছে। কিন্তু টাস্কফোর্সের মাধ্যমে জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ অচলাবস্থায় রেখে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে প্রধানত সেটেলার বাঙালিদেরকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে যা আপনার ভাষণে '৬২৩টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে' বলে উল্লেখ রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের পদ্ধতি এতদাঞ্চলের জুম্ম জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তো নয়ই, অধিকন্তু এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিরই পরিপন্থী।

চুক্তি বাস্তবায়নে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের খন্ডিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ: এটা নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের মধ্যকার একটি স্বার্থান্বেষী মহল অতি সুক্ষ্মভাবে ভুল ও মনগড়া তথ্য দিয়ে চলেছে। শুধু ভুল ও মনগড়া তথ্য প্রদান নয়, তারা ভুলভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে পার্বত্য চুক্তিতে গৃহীত বিষয়গুলো ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে তারা অতি সুক্ষ্মভাবে সেই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিবেচনা করা যায়। এর ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে একধরনের ভুল বুঝাবুঝি, বিভ্রান্তি ও দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়ন না করেও 'সম্পূর্ণ' বা 'আংশিক' বাস্তবায়নের দাবি করা সবচেয়ে উদ্বেগজনক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৌলবাদী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তথা কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল এ চুক্তির বাস্তবায়ন চায় না। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যেমনি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে, সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেও তেমনি এই মহল লুকিয়ে রয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও এসব গোষ্ঠী নানা উদ্ভট ও কল্পকাহিনী অবতাড়না করে চুক্তির বিরোধিতা করেছিল। বর্তমানেও তারা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার ধোয়া তুলে এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের স্বার্থে এসব মৌলবাদী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তথা কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও কঠোর অবস্থান নিতে হবে। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য পরিসংখ্যানের পরিবর্তে অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিচিহ্নিত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়ের প্রতিবেদন পেশ: চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুসারে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কর্তৃক গত ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ" এবং তৎসঙ্গে ১৬টি পরিশিষ্ট (সাপোর্টিং ডকুমেন্ট) সম্বলিত প্রতিবেদন আপনার নিকট জমা দেয়া হয়েছে। পেশকৃত উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে গত ৬ আগস্ট ২০১৫ গণভবনে আপনার সাথে তাঁর আবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে এখনো কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি যা অত্যন্ত হতাশা ও উদ্বেগজনক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে 'শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ...সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে পার্বত্যবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে' যে দাবি করেছেন তাও একপ্রকার সত্যের অপলাপ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ দেশের আদিবাসীদের দাবিদাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা আদিবাসী জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি সংবিধানে ৬(ক) ধারার মাধ্যমে দেশের সকল জনগণকে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসহ দেশের আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালি বানানো হয়েছে। জুম্ম জনগণের আত্মপরিচয়ের অধিকারকে অস্বীকার করে এভাবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জুম্ম জাতির উপর ভিন্ন জাতির জাতিগত পরিচিতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে 'এই অঞ্চলের জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি'র চিত্র তুলে ধরেছেন। চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক বর্তমান সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হলেও উন্নয়নের নামে বারদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই আত্মসাৎ করা হচ্ছে। সর্বোপরি চুক্তি মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নসহ সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিধান থাকলেও তা আজ অবধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

প্রসঙ্গত ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, চুক্তির 'গ' খন্ডের ৯(গ)নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের যে বিধান রয়েছে তা এখনো কার্যকর ও অনুসরণ করা হয় না। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে ১০ এপ্রিল ২০০১ সালে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার পরিপত্র জারি করা হলেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।

উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন: আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অগোচরে ও আলোচনা ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর গুইমারা উপজেলা, সাজেক থানা ও বড়থলি ইউনিয়ন গঠনের যে বিবরণ আপনি আপনার ভাষণে তুলে ধরেছেন সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, ঠেগামুখ স্থল বন্দর স্থাপন, স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ ও পর্যটন কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষিত ও সংরক্ষিত বন ঘোষণা, বিজিবির বিওপি স্থাপন ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ ছাড়াই গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হলেও এখনো পূর্বের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। ফলে চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই উন্নয়নের ধারা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

শিক্ষা খাতে উন্নয়ন: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে 'প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যাতে ভালভাবে পড়ালেখা করতে পারে সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল ও কলেজ নির্মাণ করা হবে' বলে উল্লেখ করেছেন তজ্জন্য জনসংহতি সমিতি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও বেহাল অবস্থায় বিরাজ করছে। তজ্জন্য শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথা জনসংহতি সমিতি বরাবরই তুলে ধরে আসছে।

বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষাকে বেহাল অবস্থায় রেখে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্বে পার্বত্যবাসীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ চায় না। তা সত্ত্বেও যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এখনো অর্জিত হয়নি, পার্বত্যবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়নি এবং জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে সর্বাত্মকভাবে সরকারি ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে রাঙ্গামাটি শহরে নামেমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বলাবাহুল্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর যোগান দেয়ার মতো পার্বত্যবাসীর অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত ভিত্তি এখনো গড়ে উঠেনি। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা, স্বাতন্ত্র্যতা, জাতিবৈচিত্র্যতা, পশ্চাদপদতা, ভূমি

সমস্যা ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। স্বভাবতই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হলে ৯০% এর ক্ষেত্রে বহিরাগতরাই সুযোগ পাবে। এর ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি জুম্মবিরোধী রাজনৈতিক কেন্দ্র এবং বহিরাগত ব্যক্তির অভিবাসনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হবে যা এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পার্বত্যবাসীর শিক্ষা প্রসারে অবদান রাখার পরিবর্তে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাদি আরো জটিল করে তুলবে।

বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্রদের দিয়ে ইতিমধ্যে রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ১৭ অক্টোবর ২০১৫ বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্র শামসুজ্জামান বাপ্পির নেতৃত্বে কতিপয় বহিরাগত ও ছাত্রলীগের কর্মীরা যৌথভাবে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে জুম্ম ছাত্রদের উপর এবং কলেজের বাইরে জুম্ম পথচারীদের উপর হামলা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্মস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পার্বত্যবাসীদের বিরোধিতার মুখে বর্তমানে সার্বক্ষণিক সেনা ও পুলিশ প্রহরাধীনে নজীরবিহীনভাবে এসব বিতর্কিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পর্যটনসহ অন্যান্য খাতে জুম্ম সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিরোধী উন্নয়নঃ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'পার্বত্য জেলার বেশকিছু এলাকা পর্যটন উপযোগী করে গড়ে উঠেছে, যা ইতোমধ্যে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে'। উল্লেখ্য যে, রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা, রাবার চাষ ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে ভূমি ইজারা প্রদান, সেনা ও বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন, বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদির নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ, হুকুম দখল বা জবরদখল করা হচ্ছে। এসব জমি হচ্ছে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় মৌজা ও জুম ভূমি যা জুম্মদের প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, মৌজাবাসী ও সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিকদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে এসব ভূমি অধিগ্রহণ, হুকুম দখল বা জবরদখল করা হচ্ছে। এসব অবৈধ ভূমি হুকুম দখল ও জবরদখলের বিরুদ্ধে পাহাড়ি-বাঙালি অধিবাসীরা বাধা দিতে চাইলে তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে ও তাদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। ত্রাস সৃষ্টি করে ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র বিশেষে জুম্ম নারী ও শিশুদের ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণসহ বর্বরোচিত সহিংসতা চালানো হচ্ছে। হামলা, হয়রানি, মিথ্যা মামলার মাধ্যমে জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে তাদের স্ব স্ব চিরায়ত ভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বান্দরবান জেলায় প্রায় ৩০টি গ্রাম থেকে জুম্ম গ্রামবাসীরা উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এসব উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ জুম্ম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ভেঙ্গে পড়ছে এবং দরিদ্র থেকে অধিকতর দরিদ্র হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য জেলার পাহাড়ে ও বনাঞ্চলের মধ্যে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সড়ক নির্মাণের ফলে বনাঞ্চল উজার হয়ে পড়ছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। উন্নয়নের নামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জাতিসত্তা ও জীবনধারা তথা জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংসকারী এসব উন্নয়ন কার্যক্রম অচিরেই বন্ধ করা অতীব জরুরী বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমঃ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন 'চুক্তির ফলে প্রায় সুদীর্ঘ ২২ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বয়ে চলে শান্তির সুবাতাস'। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তির ফলে আড়াই দশকের সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ হলেও স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, নারীর উপর সহিংসতা, সেনা নির্যাতন ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক ১৮টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এসব হামলায় জুম্মদের শত শত ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে। হতাহত হয়েছে শত শত ব্যক্তি। এসব হামলায় জড়িত কাউকেই বিচারের আওতায় আনা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনীর তল্লাসী অভিযান, ধরপাকড়, আটক, রাজনৈতিক হয়রানি ইত্যাদি জোরদার করা হয়েছে। ফলে জুম্ম জনগণ এক নিরাপত্তাহীন জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে নিম্নোক্ত চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে–

- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পরিবর্তে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র জোরদার করা হয়েছে;
- আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ'-এর নামে একপ্রকার সেনা শাসন ও কর্তৃত্ব জারি রয়েছে এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে;
- জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যর্পণের পরিবর্তে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল ও তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে;
- উন্নয়নের নামে তথা চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা, ক্যাম্প স্থাপন, ভূমি ইজারা প্রদান ইত্যাদি জুম্ম-স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে;

- সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে এবং জুম্মদের মধ্যে তাবেদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে;
- সাম্প্রদায়িক হামলা, উচ্ছেদ, হত্যা, নারী ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ, রাজনৈতিক হয়রানি, ধরপাকড়, সেনা অভিযান ও তল্লাসী, বহিরাগত অনুপ্রবেশ ইত্যাদির ফলে জুম্ম জনগণ এক নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে।

ভাষণে এমপি উষাতন তালুকদারের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া: জাতীয় সংসদের উক্ত বৈঠকে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদারের তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন ছিল, "পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র কি; চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা? না হলে উহার কারণ কি?" প্রধানমন্ত্রী তাঁর উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র যথাযথভাবে তুলে ধরতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যথাযথ ও সম্যকভাবে অবহিত নন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর চলমান বৈষম্য ও বঞ্চনা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ক্ষোভ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী গভীরভাবে ওয়াকিবহাল নন। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমানে জুম্ম জনগণের অসহযোগ আন্দোলন চলমান রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জুম্ম জনগণ তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের স্বার্থে আত্মবলিদানে ভীত না হয়ে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে সরকার যদি জুম্ম জনগণকে অধিকতর কঠোর আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়, তার ফলে উদ্ভূত যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে তা জনসংহতি সমিতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

আরো উদ্বেগের বিষয় যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর উত্তরে 'চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ' প্রসঙ্গে কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। তাঁর ভাষণে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। এমনকি তাঁর ভাষণে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কেও কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে 'সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক' বলে যে দাবি করেছেন তার অসারতা প্রমাণিত হয়। তার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। চুক্তি বাস্তবায়নে যদি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকে, তাহলে সেই কার্যক্রমকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে না বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

চুক্তি বাস্তবায়নে জনসংহতি সমিতির আহ্বান: পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সে লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ অত্যাবশ্যক। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে যে–

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য পরিসংখ্যান তুলে না ধরে ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে পেশকৃত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো পরিচিহ্নিত করে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কার্যকর কর্মসূচি ঘোষণা করা।

৩. আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক দৃঢ়তা নিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা।

---

২১ পৃষ্ঠার পর

বিজিবির বরকল ও ছোট হরিণা জোন

বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জায়গা-জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ ও বেদখল করা হচ্ছে। জুম্মদের বাস্তুভিটা ও বাগান-বাগিচা হুকুম দখল নোটিশ প্রদান করে জুম্মদেরকে তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের জায়গা-জমি ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে বা পুরোনো ঘরবাড়ি মেরামত করতে দেয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জমি অধিগ্রহণের জন্য হুকুম দখল নোটিশ জারি করা হয়েছে। হুকুম দখল নোটিশ জারীর পূর্বে ভূমি মালিকদেরকে অবহিত করা হয়নি বা তাদের সম্মতিও নেয়া হয়নি। কান্যারাম চাকমাকে ঘরবাড়ি তুলতে বাধা দেয়া হচ্ছে। তাদের নিজের জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে বিজিবি সদস্যরা বাধা দিয়েছে। এ জমি বিজিবি কর্তৃপক্ষের বলে বিজিবি দাবি করছে।

অন্য সময়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে এ ধরনের বড় সমস্যা ছিল বলে বলা যায় না। কিন্তু বর্তমানে বরকল সদর জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আলাউদ্দিন আল মামুন ও ছোট হরিণাজোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের আমলে এ ধরনের হয়রানি ও নিবর্তনমূলক কর্মকান্ড জোরদার হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বরকল সদর জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আলাউদ্দিন আল মামুন ও ছোট হরিণা জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের হয়রানিমূলক কর্মকান্ড বিষয়ে ইতিমধ্যে বিজিবি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু কোন কর্তৃপক্ষই তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ বিজিবির হয়রানি ও নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এলাকাবাসী বরকল সদর জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আলাউদ্দিন আল মামুন ও ছোট হরিণা জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসকে অনতিবিলম্বে অন্যত্র বদলিসহ যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের প্রেক্ষিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার কর্তৃক প্রদত্ত সংসদীয় বক্তব্য

স্পীকারঃ ...রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত জনাব উষাতন তালুকদার। মাননীয় সদস্য, আপনার সময় বার মিনিট।

উষাতন তালুকদার এমপিঃ মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বর্তমান সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক, ন্যায়-ভিত্তিক এবং জ্ঞান-নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। এসকল লক্ষ্য অর্জনে সরকার ২০১০ থেকে ২০২১ মেয়াদে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার কথাও বলেছেন। এছাড়া ২০২১ সালে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় বেশ কিছু অগ্রাধিকার নির্ধারণের কথা বলেছেন। যেমন বহুমুখী প্রবৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান, উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা তৈরী ও শক্তিশালী অবকাঠামো নির্মাণ, একটি জ্ঞান ও সুশাসন ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ দেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। এজন্য আমি, মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে, মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার, ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার জন্য আন্দোলনের মাস, পৃথিবীতে কোথাও নজীর নেই যে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি জানিয়ে সেই মহান গণপরিষদে দাবি উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী উনাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো। তাই উনিসহ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন–সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরো অনেককে, মহান জাতীয় সংসদে আমি সকল ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে নৃভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি আজকে এই মহান সংসদে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এদেশে যেখানে ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দেয়া হয়েছে সেদেশে বসবাসরত বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষিদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষির মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়নি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৩ নম্বর ক্রমিকের খ(২) নম্বর উপ-অনুচ্ছেদে প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের কথা উল্লেখ আছে। তাই, মাননীয় স্পীকার, যত দ্রুত সম্ভব পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভিন্ন ভাষাভাষিদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছায়, আন্তরিকতায় এই পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত উনার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার কারণে, গতকালকে উনি যেভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি অনুভব করেছি উনি অন্তর দিয়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন। পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে শুধু মহান সংসদে নয়, জাতির উদ্দেশ্যে বলার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পার্বত্যাঞ্চলে চুক্তির পরবর্তী সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে এটা অনস্বীকার্য। গতকালকের দীর্ঘ আলোচনার পরেও তবু আমি এই মহান সংসদে, বিশেষ করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে আরও কিছু আলোকপাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি, মাননীয় স্পীকার।

পার্বত্য চুক্তির স্পিরিট কী ছিলো? কেন পার্বত্য চুক্তি হয়েছিলো? এই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সরকার জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তারই আলোকে পার্বত্য চুক্তির স্পিরিটটা হলো, সেখানকার বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা, ভূমি

অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তন করা। সমতলের জেলা পরিষদের বাইরে পার্বত্যাঞ্চলে বিশেষ শাসন কাঠামোর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই এই স্পিরিটের মধ্য দিয়ে সেই পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ৭২ ধারার মধ্যে ৪৮ ধারা বাস্তবায়িত (সম্পাদিত) হয়েছে। আমি আজকে কতগুলো ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে সেসব বিষয়ে না গিয়ে আমি যে বিষয়টা আলোকপাত করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত অনেক শাসক যারা সেখানে যান উনাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা, ঔপনিবেশিক কায়দায় সেই এলাকা শাসন করার মানসিকতা বিরাজমান। তাই এসব বিষয়গুলো আমাদেরকে বিবেচনায় রেখে আমি যে বিষয়টা উল্লেখ করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কেননা একটি অংশকে অবহেলিত রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় ও কার্যাবলী কার্যকরকরণ, অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, আদিবাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ, চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ২০০১ সংশোধন করিয়ে এই আইন অচিরেই কার্যকর করা ইত্যাদি অন্যতম। বিশেষ করে বর্তমানে অনেক কিছু বিষয় ক্ষমতায়ন করা হলেও আসলে বাস্তবে এখনো আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ অকার্যকর রয়েই গেছে। সেখানে সমতলের জেলা পরিষদ আর পাহাড়ের জেলা পরিষদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা হল বিশেষ শাসন বিধান। সেসব আইনের আলোকে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে ক্ষমতায়ন না করার কারণে এখনও জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার, মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে পার্বত্য জেলাগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কথা বলেছেন। দেশের দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন হোক সেটা আমরা চাই, তবে উন্নয়ন উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নয়। সংস্কৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করে সকল প্রকারের উন্নয়ন করা প্রয়োজন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকার জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামেবর্তমানে পর্যটন শিল্পের উপরে আমাদের দেশের যারা শিল্পপতি বা দেশবরেণ্য লোক রয়েছেন, উনাদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পর্যটন শিল্প নিয়ে অনেককিছু ভাবছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমি মনে করি, সেখানে উন্নয়ন করা যেতে পারে, পর্যটন শিল্পের বিকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শান্তি। আসলে চুক্তির ১৮ বছর পরেও আদৌ সেখানে পূর্ণাঙ্গভাবে স্থিতিশীলতা আসেনি। সেখানে পার্বত্য চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো অচিরেই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের হাতে যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদান করেই সেখানে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। তবেই পর্যটন শিল্প বলেন, উন্নয়ন বলেন, সবকিছু করা সম্ভব হবে।

তাই আমি যে বিষয়টা আজকে গুরুত্ব দিয়ে মহান সংসদে বলতে চাচ্ছি তা হলো, সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে কিছু কিছু লোকজন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে লক্ষ্য করা যায় তা আদৌ কাম্য নয়। বিশেষ করে অনেকে মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা হলে এই পার্বত্য এলাকা হয়তো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারে। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, সেখানে যে বঞ্চনা, উপেক্ষা, অবহেলা বিদ্যমান রয়েছে তা থেকেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওরাও আমাদের লোক, ওরাও এখানকার নাগরিক, তাদের সমস্যা, তাদের দুঃখ আমাদের বুঝতে হবে। আমি মনেকরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুঃখ বোঝেন এবং এখানে যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, নীতিনির্ধারকরা রয়েছেন, আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা রয়েছেন, উনারাও অবশ্যই সেখানকার লোকদের দুঃখ-বেদনা বোঝেন। তাই সেই অনুভূতি থেকে, সেই ভাবনা থেকে আজকে আমি মনেকরি, মানুষের শরীরের ছোট একটি বিষফোঁড়া যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা করা না হয় সেটা পরবর্তীতে ক্যান্সারে পরিণত হবে... (মাইক বন্ধ করা হয়)

স্পীকারঃ মাননীয় সদস্য,...দুই মিনিট বলুন, দুই মিনিটে শেষ করুন।

উষাতন তালুকদার এমপিঃ ...ঠিক তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অবহেলা করা হলে ভবিষ্যতে এটি ক্যান্সারের মত বড় ধরনের সমস্যায় পরিণত হতে পারে। তাই ক্যান্সারে পরিণত হবার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যসহ আমাদের সদাশয় সরকারের কাছে তথা বাংলার আপামর মানুষের কাছে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি– আসুন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে দূরে ঠেলে দেয়া নয়, মূল স্রোতধারায় টেনে আনার জন্য, আরও কাছে টেনে এনে এই পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে দেশের অমঙ্গল হবে না, দেশের মঙ্গল হবে। পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে শুধুমাত্র পর্যটন শিল্প থেকে হাজার কোটি কোটি টাকা আয় হবে এবং দেশেরই মঙ্গল হবে। আমি আশা রাখবো, আমাদের সদাশয় সরকার এই বিষয়ে এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, আপনারা সকলে বিষয়টা আরও গভীরভাবে ভেবে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সকলে এগিয়ে আসবেন– এই প্রত্যাশা রেখে আমি সবাইকে আরও পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে, মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

স্পীকারঃ ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

বিশেষ প্রতিবেদন

বিজিবির বরকল ও ছোটহরিণা জোন কমান্ডারের হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর বাজার বর্জন

বরকল উপজেলায় বিজিবি কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর হয়রানি, ধর্মীয় পরিহানি, জন-চলাচলে বাধা, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা, ক্যাম্প স্থাপনের নামে জোরপূর্বক জুম্মদের জায়গা-জমি দখল ও উচ্ছেদ অব্যাহত রয়েছে

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর বরকল সদর জোনের (২২ ব্যাটালিয়ন) জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আলাউদ্দিন আল মামুন ও ছোট হরিণা জোনের (২৫ ব্যাটালিয়ন) জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর হয়রানি, ধর্মীয় পরিহানি, জন-চলাচলে বাধা, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা, ক্যাম্প স্থাপনের নামে জোরপূর্বক জুম্মদের জায়গা-জমি দখল ও উচ্ছেদের প্রতিবাদে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য উপজেলার বরকল বাজার, ছোট হরিণা বাজার, ভূষণছড়া বাজার, কলাবন্যা বাজার বর্জন শুরু হয়।

বরকল এলাকাবাসীর নামে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে জানা যায় যে, বিজিবির দুই জোন কমান্ডারের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও এলাকাবাসীর সাথে সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পরিবর্তে বরকল উপজেলায় জুম্ম জনগণের উপর নানা ধরনের হয়রানি, ধর্মীয় পরিহানি, জনপ্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষের চলাচলে বাধা ও অহেতুক তল্লাসী, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা, ক্যাম্প স্থাপনের নামে জোরপূর্বক জুম্মদের জায়গা-জমি দখল ও উচ্ছেদ, নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ ও গৃহ নির্মাণে বাধা-নিষেধ, বনজ সম্পদ ও কৃষিপণ্যবাহী নৌযান আটকিয়ে হয়রানি ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। বিজিবির এ ধরনের হয়রানি ও নিবর্তনের ফলে বরকল উপজেলাবাসীসহ এ উপজেলায় বিভিন্ন কাজে যাতায়াতকারী জনসাধারণকে এক ভীতিকর ও নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে।

বরকল উপজেলাধীন কর্ণফুলী নদীর বিভিন্ন ঘাটে কৃষিপণ্য ও বনজ সম্পদবাহী নৌযান আটকিয়ে তল্লাসীর নামে বিজিবি সদস্যরা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের হয়রানি করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। নৌযান থেকে তারা তাদের ইচ্ছামাফিক পছন্দসই কৃষিপণ্য বা গাছ-বাঁশ তুলে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে তারা এসব দ্রব্যসামগ্রীর কোন মূল্য দেয় না বা দিলেও তাদের মর্জিমাফিক মূল্য দিয়ে থাকে। প্রতি সপ্তাহের রবিবার ও সোমবার কলা ব্যবসায়ীরা বরকল থেকে ট্রলার যোগে কলা নেয়ার সময় বিজিবির ঘাটে থামিয়ে তল্লাসীর নামে হয়রানি করা হয় এবং ভালো কলা ছড়াগুলো টাকা ছাড়া রেখে দেয়। টাকা দাবি করলে ন্যায্য মূল্য দেয়া হয় না। এছাড়াও কত টাকার কলা নেয়া হচ্ছে আর কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছে বাড়িতে ফেরার সময় হিসাব দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। এভাবে জুম্ম ব্যবসায়ীদের নিয়মিতভাবে হয়রানি করা হয়।

তল্লাসীর নামে বিজিবি সদস্যদের এই হয়রানি ও দুর্ব্যবহার থেকে ধর্মীয় পুরোহিত (ভিক্ষু), নারী ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। গত ৩০ নভেম্বর বৌদ্ধ পুরোহিত ধর্মতিষ্য ভিক্ষুসহ ৮ জন ভিক্ষু বহনকারী স্পীড বোট বরকল বাজার ঘাটে থামিয়ে তল্লাসীর নামে তাদেরকে অপদস্থ ও হয়রানি করা হয়। তাদের সঙ্গে থাকা বুদ্ধমূর্তি, সাভেক (ভিক্ষুদের খাবার বাসন) ও ব্যাগ ইত্যাদি অশোভনীয় ও অপমানজনকভাবে তল্লাসী করে। সোনা পাচারের অজুহাত তুলে বুদ্ধমূর্তি ও সাভেকগুলো লাঠি ঢুকিয়ে ও স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে পরীক্ষা করে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে বৌদ্ধভিক্ষুদের হয়রানি করা হয়।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যদের বহনকারী নৌযান থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার লোকজন ও সাধারণ যাত্রীবাহী নৌযানগুলোকে বিজিবির ঘাটে ঘাটে ভিড়াতে বাধ্য করে। এসব ঘাটে তাদের ইচ্ছামাফিক যাত্রীদেরকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করে। তল্লাসীর নামে যাত্রীদের নানাভাবে হয়রানিও করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের ক্ষেত্রেও সরকারি-বেসরকারি লোকদেরকে বিজিবি জোনের অনুমতি নিতে হয়। অনেক সময় যথাসময়ে বিজিবির অনুমতি না পাওয়ার ফলে বা অনুমতি পেতে বিলম্ব হওয়ার কারণে সময়মত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনেও ব্যাঘাত ঘটছে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ ঠেগামুখ এলাকায় স্কুল পরিদর্শন শেষে বরকল সদরে ফেরার পথে বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে ছোট হরিণা বাজারস্থ বিজিবি জোন ঘাটে থামাতে বাধ্য করে। তাঁকে আটকানোর জন্য ঠেগামুখ এলাকায় বিজিবি সদস্যরা এসময় অস্ত্র তাক করে ওৎপেতে থাকে যা ছিল এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। পরিদর্শনে যাওয়ার সময় কেন জোন ঘাটে বোট ভিড়ানো হয়নি অভিযোগ এনে এই জনপ্রতিনিধিকে জোন কমান্ডার শাসান। বিজিবি কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ঐ এলাকা দিয়ে কোন পশু-পক্ষীও যেতে পারে না বলে এসময় জোন কমান্ডার জানান। এভাবে আইমাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে বিজিবি সদস্যরা হয়রানি করে চলেছে।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করে সার্কেল চীফদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকরাও স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানে মন্ত্রণালয়ের পুন:অভিমত

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পদদলিত করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে অতি সম্প্রতি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্কেল চীফদের পাশাপাশি পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকরাও তিন পার্বত্য জেলাসমূহে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন মর্মে মতামত প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও সার্কেল চীফদের নিকট প্রেরিত পত্রে [নং-পাচবিম(প-১)পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭ এবং তারিখ ঃ ২১/১২/২০০০] বর্ণিত হয় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকগণের পাশাপাশি তিন সার্কেল চীফগণও চাকুরি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন।" উক্ত পত্রে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের পরিপন্থী।

আরো উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষত চাকুরি, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী বাসিন্দাগণ চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে অ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হতে উক্ত ধরনের সার্টিফিকেট গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় বিশদভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদান বাতিল করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আজ অবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এমতাবস্থায় গত ২৬ জুলাই ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেপুটি কমিশনার ও সার্কেল চীফ কর্তৃক সনদপত্র প্রদান করা বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা সম্বলিত পত্র বাতিল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করার" জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

এপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে মতামতের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব এর সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী মারমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল মোমেন চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব প্রিয়জ্যোতি খীসা, তিন পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ (রাজস্ব) উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় কে এস মং মারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক কেবলমাত্র সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান কার্যকরকরণের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এ সময় রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন, বোমাং ও চাকমা সার্কেল– এই নামেই বুঝা যায় তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে অভিমত করে সাম্প্রদায়িক মতামত তুলে ধরেন। তাই কেবলমাত্র সার্কেল চীফদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে পার্বত্যবাসীর সমঅধিকার নিশ্চিত হবে না। জেলার ডেপুটি কমিশনারদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হলে সমঅধিকার নিশ্চিত হবে বলে তিনি মনগড়া অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সময় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরীও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা জেলা প্রশাসকদেরও দেয়া দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে এ প্রসঙ্গে সরাসরি কোন কিছু মতামত না দিয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা উচিত। এ সময় কে এস মং মারমা বলেন, সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিতে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকরা যেভাবে চুক্তি পরিপন্থী বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সরকারের স্বাক্ষরিত একটি রাজনৈতিক চুক্তির বিধানাবলীর বিরুদ্ধে একজন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এভাবে মতামত দেওয়ারও কোন এখতিয়ার নেই বলে তিনি প্রতিবাদ করেন।

তা সত্ত্বেও আঞ্চলিক পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে উক্ত চিঠি আঞ্চলিক পরিষদকে প্রেরণ করা হয়। উক্ত চিঠিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মতামত যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো- "আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রদত্ত মতামত সঠিক আছে। অতএব, সার্কেল চীফগণের পাশাপাশি পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ উক্ত জেলাসমূহের অধিবাসীদের স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন"।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় ব্রিটিশ শাসনামল হতে বরাবরই বিশেষ আইন ও বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে শাসিত হয়ে আসছে। তদ্‌সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারি কর্মকর্তার অধীনে পরিচালিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হয়। উক্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে নতুন ও বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ব্রিটিশ কর্তৃক প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের জন্য সাধারণ প্রশাসন, ভুমি ও রাজস্ব, বিচার ও অন্যান্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং স্থানীয় সরকারতুল্য শাসন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের (সার্কেল চীফ, মৌজার হেডম্যান ও পাড়ার কার্বারীর) উপর ভুমি ও রাজস্ব, স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা, প্রথাগত আইন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ছাড়া সার্কেল চীফদের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারকে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত নতুন ও বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধিত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবন্টন বা কর্মবন্টন প্রণীত হয়। এ সব বিধানের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপিত হয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্বেকার স্থানীয় সরকারতুল্য বিশেষ শাসন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহাল রাখা হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী ভূমি ও রাজস্ব, সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা এসব পরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি উন্নয়ন কর, জুমচাষ ও জুমের খাজনা, রিজার্ভ ফরেষ্ট ব্যতীত অন্যান্য বন এবং প্রথাগত আইন ও বিচার সম্পর্কিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বজায় রাখা হয় এবং ক্ষেত্রমত আইন প্রণয়ন, সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় সার্কেল চীফগণ যাতে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন সে ধরনের বিধানও রাখা হয়।

অপরদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৪ ধারার (৫) উপ-ধারায় কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা তা স্থির করার এবং সে বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা "ডেপুটি কমিশনারের" স্থলে "সার্কেল চীফের" উপর প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, উক্ত আইনের ৪ ধারায় সংযোজিত (৬) উপ-ধারায় কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা তা নির্ধারণ করার এবং সে বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা সার্কেল চীফের উপর প্রদান করা হয়েছে। সঙ্গতকারণে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে সংজ্ঞায়িত "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" এর সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই ডেপুটি কমিশনারকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে না। একইভাবে কোন জুম্মকে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান বিধিসঙ্গত হতে পারে না।

আরো উল্লেখ্য যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে এবং 'চার্টার অফ ডিউটিস অব ডেপুটি কমিশনারর্স'-এ ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানের কোন বিধান নেই। 'চার্টার অফ ডিউটিস অব ডেপুটি কমিশনারর্স'-এর ১১ নং ক্রমিকের ৫ নং উপ-ক্রমিকে কেবল 'Granting of Domicile certificate' বা নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, "সার্কেল চীফগণের পাশাপাশি পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ উক্ত জেলাসমূহের অধিবাসীদের স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন" আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ মতামত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এটি নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু থেকে আরো সংখ্যালঘুতে পরিণত করার কাজে সহযোগিতা করবে যেটি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত এই চুক্তি বিরোধী নির্দেশনা ও মতামত অচিরেই প্রত্যাহার করা অত্যাবশ্যক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

বিশেষ প্রতিবেদন

আঞ্চলিক পরিষদ ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কাপ্তাই-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-ঠেগা রাস্তার জরিপ শুরু

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধানকারী এবং আদিবাসী জনগণের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে যথাযথ আলোচনা ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলায় ১২৩ কি.মি দীর্ঘ কাপ্তাই-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-ঠেগামুখ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার জরিপ শুরু করেছে।

জানা যায় যে, এই বছরের শুরুতে সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তায় "চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট" এর আওতায় এই জরিপ শুরু করেছে। উক্ত প্রকল্পের বিশ্বব্যাংকের একজন প্রতিনিধি ও অর্থনীতিবিদ কে. এস. এইচ. রাও গত বছরের শেষে রাঙ্গামাটি ভ্রমণ করে এবং রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমার সাথে গত ১ জানুয়ারি ২০১৬ সাক্ষাৎ করে বলে জানা যায়। সড়কটি বাংলাদেশ আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর দ্বারা নির্মিত হবে বলেও গণমাধ্যমের প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়।

সড়কটি নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নির্মাণাধীন থেগা স্থল বন্দরের সাথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সংযোগ গড়ে তোলা। স্থানীয় আদিবাসী জনগণ পরিদর্শনকারী প্রতিনিধি দলের যেকোনো আলোচনা সভা বর্জনের মধ্য দিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ মিজোরাম বিধানসভার সদস্য (এম.এল.এ.) নিহার কান্তি চাকমার নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন ঠেগামুখ স্থল শুল্ক স্টেশন পরিদর্শন করে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলায় ঠেগা ইউনিয়নে টেগা নদীর মুখে স্থল বন্দর নির্মাণ করা এবং বন্দরের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামোর উন্নয়ন সংযোগ করা। প্রকল্পের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড়ে আরো একটি স্থল বন্দর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ রামগড় স্থল বন্দর বিষয়ে মতামত দিলেও সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করে ঠেগামুখ স্থল বন্দর বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলে জানা যায়। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত উপেক্ষা করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। এছাড়া সরকার বাঘাইছড়ি-হরিণা-ঠেগা রাস্তা, নানিয়াচর-লংগদু-হরিণা-ঠেগা রাস্তা এবং রাজস্থলী-জুরাছড়ি ঠেগা রাস্তা নির্মাণেরও চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানা যায়। অভিজ্ঞ মহলের মতে যদি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় তাহলে প্রকল্পের আশেপাশে এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। প্রকল্পটির জন্য বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে সড়ক নির্মাণ করতে হবে। এতে করে প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া ব্যাপক আকারে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটবে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃত জুম্ম-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আদিবাসী সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতিতে (সেফগার্ড পলিসি) রয়েছে আদিবাসী অঞ্চলের বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সেক্ষেত্রে স্থানীয় আদিবাসী জনগণের সাথে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনসহ "স্বাধীন ও পূর্বাবহিত আলোচনা" করতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এই সংযোগ প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাংকের সেফগার্ড পলিসির লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করা যায়। অধিকন্তু এই প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করার যে বিধান রয়েছে সেই আইনগত বাধ্যবাধকতাও লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে বলা যায়।

আরো জানা যায় যে, সম্ভাব্য সমীক্ষার অংশ হিসেবে, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ রাঙ্গামাটি জেলার পাহাড়ি ভাষাভাষী গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ব্যাপক সংলাপ সম্পন্ন করেছে বলে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রথম পর্যায়ে ঠেগামুখ ও চট্টগ্রামের সম্ভাব্য সংযোগকারী ৮টি রুটকে নিয়ে ২১ টি পরামর্শ সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০ জন স্থানীয় লোকের সাথে ৮০ টির অধিক পরামর্শ সম্পন্ন করেছে বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব পরামর্শ ও কারিগরি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এলজিইডি দু'টি বিকল্প তালিকাভুক্ত করে– একটি সড়ক পথ এবং অন্যটি সড়ক পথ ও নৌ পথ সমন্বিত– আরো অধিকতর মূল্যায়নের জন্য কাজ করছে বলে জানা গেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের যোগাযোগ করে এ ধরনের যথাযথ সংলাপের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

---

৩০ পৃষ্ঠার পর

সারাদেশে গণমানববন্ধন

গঠন করা হবে" মর্মে নির্বাচনী অঙ্গীকারে আবদ্ধ একটি সরকারের প্রশাসন থেকে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী আচরণ আশা করা যায় না বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের এই অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং এই নীতি পরিহার করে জেলাবাসীর রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনকে আহ্বান জানান।

বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষমতাসীন দলের নজীরবিহীন ভোট ডাকাতির মাধ্যমে রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত

প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতির আহ্বানে রাঙ্গামাটি জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ পালিত

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী দেশের সর্বমোট ৩২৩টি পৌরসভার মধ্যে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুইটি পৌরসভা বাদে পাঁচটি পৌরসভা নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সারাদেশে পৌরসভা নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও দেশের অন্যান্য পৌরসভার মতো রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচনেও তার লেশমাত্র লক্ষণ দেখা যায়নি। বরঞ্চ অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে এবারের পার্বত্য এলাকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানা খবরসহ বিশেষ করে রাঙ্গামাটি পৌরসভায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের মেয়র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, নজীরবিহীন জাল ভোট, ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়ম, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও কর্মীদের উপর হামলা, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি পৌরসভা ব্যতীত রাঙ্গামাটি পৌরসভাসহ বান্দরবানের বান্দরবান ও লামা পৌরসভা এবং খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি ও মাটিরাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পাঁচ পৌরসভার মধ্যে রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমাকে জনসংহতি সমিতি সমর্থন প্রদান করে। শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশ দূরের কথা, রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচনের কমপক্ষে ১১টি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলীয় প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের হামলা ও সহিংসতা, কেন্দ্র দখল ও ভোট জালিয়াতির মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। এসব কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের অনুপস্থিতিতে ভোট গণনার অভিনয় করে ইচ্ছামাফিক ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত মেয়র পদের বেসরকারী ফলাফল অনুসারে আওয়ামীলীগ সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী মোঃ আকবর হোসেন চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৭৯৪৩, জনসংহতি সমর্থিত প্রার্থী গঙ্গা মানিক চাকমার ১০১৯৮, বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী বিদায়ী পৌর মেয়র মোঃ সাইফুল ইসলাম চৌধুরীর ৭৩৫৫, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ রবিউল আলম রবির ২৩৫৮, জাতীয় পার্টির প্রার্থী ডাঃ শিব প্রসাদ মিশ্র'র ২৪৭, স্বতন্ত্র প্রার্থী অমর কুমার দে'র ৪০ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান ২৯। উল্লেখ্য যে, গতবারের পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ভুট্টো ১০৮৮৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন, স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতীম রায় পাম্পু পান ৮৯১৫ ভোট, আওয়ামীলীগ প্রার্থী আব্দুল মতিন পান ৮১৬৩ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মনিরুজ্জামান মহসিন পান ৬০৬৩ ভোট। গতবারের ভোট প্রাপ্তির পরিমাণ আর এবারের ভোট প্রাপ্তির পরিমাণের পরিসংখ্যান থেকেও রাঙ্গামাটিতে এবারে বিজয়ী মেয়র প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুত রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকরা এবং দলের স্থানীয় নেতৃত্ব যে অনিয়ম ও কারচুপির আশ্রয় নেবেন এবং অঘটন ঘটাবেন তা আগে থেকে পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছিল। নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকে একদিকে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদারের নানা উস্কানিমূলক বক্তব্য, অপরদিকে দল বা দলের প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের প্রচারকাজে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি, হুমকি ও হামলার চেষ্টা করা হচ্ছিল। রাঙ্গামাটি পৌরসভার ভোটার নন এমন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনের পূর্বে রাঙ্গামাটি পৌর এলাকা ত্যাগের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ তাদের নীল-নকশা অনুসারে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে লোক এনে শহরের বিভিন্ন হোটেল ও বিশ্রামাগারে জড়ো করে রাখে। এব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করা হয়। কিন্তু প্রশাসনের নাকের ডগায় রাঙ্গামাটি শহরে সেসব লোকদের জড়ো করা হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ফলে ভোট কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক তাদের দলীয় প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার পূর্ব-পরিকল্পনার যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল তা বাস্তবরূপ লাভের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। দুপুর থেকে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমাসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখল করে নির্বাচনে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলীয় প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের ভোট জালিয়াতির বিষয়ে জেলা প্রশাসক, জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কমিশনকে দফায় দফায় লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো হলেও যথাযথ প্রতিকার পাওয়া যায়নি। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে প্রশাসনের

ছত্রছায়ায় কেন্দ্র দখল করে নজীরবিহীন জাল ভোট প্রদান করে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে জয়যুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বলা যায়, জনসংহতি সমিতিসহ পৌরবাসীর আশঙ্কা সত্য প্রমাণ হয়ে ক্ষমতাসীন দলের নীল নকশা অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের দিন সকাল ৮:০০ টা হতে প্রায় ২:৩০ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ কার্যক্রমে প্রায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকে। এমনকি প্রশাসনও দৃশ্যত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল। যদিও এসময়েও বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী দলের প্রার্থীর কর্মীদের কর্তৃক নানাভাবে জালভোট প্রদানের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে বেলা বাড়ার সাথে সাথে রিজার্ভ বাজার এলাকার শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি শিশু একাডেমী, রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, তবলছড়ি এলাকার শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি পৌরসভা কেন্দ্র, বনরূপা এলাকার কাঠালতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লেকার্স পাবলিক স্কুল, মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানি একাডেমী, চম্পকনগর এলাকার ওয়াপদা রেস্ট হাউস, ভেদভেদি এলাকার গোধূলী আমানতবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি কেন্দ্রে সরকারী দলের প্রার্থীর কর্মীদের কর্তৃক ব্যাপক জাল ভোট প্রদানের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এমনকি এসব কেন্দ্রে সরকারী দলের প্রার্থীর জালভোট প্রদানকারী অনেকে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট ও কর্মী-সমর্থকদের সহায়তায় পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। পৌনে তিনটার দিকে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমার পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা রাঙ্গামাটি পার্ক, শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (রিজার্ভ বাজার), রাঙ্গামাটি শিশু একাডেমী (রাঙ্গামাটি পার্ক), পুরানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পুরানবস্তী), ইসলামপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ইসলামপুর), লেকার্স পাবলিক স্কুল (কাঁঠালতলী), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কাঁঠালতলী (পৌরসভা), কাঁঠালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কাঁঠালতলী), মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানী একাডেমী (বনরূপা), ওয়াপদা রেষ্ট হাউস (চম্পকনগর)-এই ১০টি কেন্দ্রে কেন্দ্র দখল, ভোট বাক্স ছিনতাই, পাইকারী হারে জাল ভোট প্রদানের অভিযোগ দায়ের করে রিটার্নিং অফিসারকে জানানো হয়। এভাবে সরকারী দলের প্রার্থীর জালভোট প্রদানকারীরা যখন জালভোট প্রদানে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কা ঘনীভুত হতে থাকে, তখনই পূর্ব নীল-নকশা অনুযায়ী সরকারী দল স্থানীয় আওয়ামীলীগ প্রশাসনের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে সরকারী দলের প্রার্থীর নেতাকর্মীদের দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নাকের ডগায় বিভিন্ন কেন্দ্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে, এমনকি কিছু কিছু বুথের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে বুথ ও কেন্দ্র কর্মকর্তাদের সামনে নির্বিচারে জালভোট প্রদান করে। এভাবে সরকারী দলের প্রার্থীরা প্রকৃতপক্ষে অবৈধভাবে ও নজীরবিহীন অনিয়মের মধ্য দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয় ছিনিয়ে নেয়। উল্লেখ্য, সরকারী দলের প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জালভোট প্রদান, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়ার সময় উভয়পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও হামলার ঘটনায় অন্তত ২০ জনের মত আহত হয়।

ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমার সংবাদ সম্মেলনঃ নির্বাচনের দিনই রাত আনুমানিক ৯:৩০ টার দিকে রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, চরম অনিয়ম ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জনসংহতি সমিতি সমর্থিত স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'রাঙ্গামাটি পৌরসভার এই নির্বাচন আওয়ামীলীগের মেয়র প্রার্থী মোঃ আকবর হোসেন চৌধুরীর সমর্থকদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর হামলা, কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জাল ভোট প্রদান, ব্যাপক কারচুপি, প্রতিপক্ষ এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি চরম অনিয়মের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে' বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, 'ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা রাঙ্গামাটি শিশু একাডেমী, শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা রাঙ্গামাটি পার্ক, লেকার্স পাবলিক স্কুল, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাঁঠালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোজাদ্দেদী আলফেসানী একাডেমী, ওয়াপদা রেষ্ট হাউস ইত্যাদি কেন্দ্রগুলো থেকে আমার এজেন্টদেরকে জোর পূর্বক বের করে দেয়া হয়। তাদেরকে হুমকি-ধামকি দিতে থাকে। এমনকি তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। আওয়ামীলীগের প্রার্থী মোঃ আকবর হোসেন চৌধুরীর সমর্থকরা পুলিশের সম্মুখে আমার সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ বাহিনী নীরব ভূমিকা পালন করে।' তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, 'কাঠালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কর্তব্যরত এস আই আনোয়ার এবং ভেদভেদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এএসআই মুণির আমাকে কেন্দ্র পরিদর্শনে বাধা প্রদান করেন।'

জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি পৌরসভার এই প্রহসনমূলক নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, চরম অনিয়ম ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকার প্রতিবাদে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে জুম্ম জনগণের চলমান অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলায় ৩ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা করে। জনসংহতি সমিতির আহুত এই কর্মসূচি জনগণের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের দাবিতে ঘুনধুম থেকে ধুধুকছড়ার ৩০০ কি:মি:সহ সারাদেশে গণ-মানববন্ধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কসহ দেশের বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬, সকাল ১০:০০ ঘটিকা থেকে ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম থেকে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ধুধুকছড়া পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কিলোমিটারসহ দেশের ২৭টি জেলায় গণ-মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাধা প্রদান ব্যতীত উক্ত গণ-মানববন্ধনে তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মানুষ শান্তিপূর্ণ, সুশৃংখল ও স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

মানববন্ধনে রাঙ্গামাটির কল্যাণপুর অংশে অংশগ্রহণ করেন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

রাঙ্গামাটি ডিসি অফিস সংলগ্ন সড়কে অংশ নেন তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

বান্দরবান জেলার মিয়ানমার সীমান্তবর্তী ঘুমধুম থেকে খাগড়াছড়ি জেলার ভারত সীমান্তবর্তী দুদুকছড়া পর্যন্ত ৩০০ কিলোমিটার সড়কের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সেদিন সকাল নয়টা থেকে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে মানুষ জড়ো হতে থাকে। জুম্মদের সঙ্গে কিছু এলাকায় বাঙালিরা মানববন্ধনে যোগ দেন। সড়কের পাশে যেখানে জনবসতি, মূলত সেসব এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সমতলের ২৪টি জেলায় একই দাবিতে একই সময়ে কর্মসূচি পালন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল: রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসন অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রামনাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরূপা দেওয়ান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মানিক লাল দেওয়ান, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক শান্তি বিজয় চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এড. হ্লাথোয়াই মারমা বক্তব্য রাখেন। রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন চাকমা সার্কেলের চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়।

লংগদুতে মানববন্ধনে অংশ নেন চাকমা সার্কেল চীফ রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, কাউখালী (ঘাগড়া) উপজেলা সদরে গণমানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি সদরে কল্যাণপুর এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের

চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় ও রানী য়েন য়েন অংশগ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটি শহরের প্রবীণদের একাংশ

বান্দরবান জেলায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নাগরিক কমিটির বান্দরবান জেলা শাখার আহ্বায়ক জুমলিয়ান আমলাই বম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী জিরকুং শাহু, রুমা উপজেলা চেয়ারম্যান অংথোয়াই চিং মারমা, রোয়াংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ক্যবা মং মারমা, নারী নেত্রী ডনাই প্রু নেলী প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ অভিযোগকরেন, মানববন্ধন বানচাল করতে পুলিশ হুমকি দিয়েছে। কয়েকটি স্থানে লোকজনকে দাঁড়াতে দেয়নি।

খাগড়াছড়ি শহরের মহাজন পাড়া, চেঙ্গী স্কোয়ার ও উপজেলা পরিষদ এলাকায় মানববন্ধনে পুলিশ বাধা দেয়। এর প্রতিবাদে শহরের একটি রেস্তোরাঁয় তিন সংগঠনের নেতারা সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে লিখিত বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচি পালনে প্রশাসন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাধা দিয়েছে।

ঢাকা অঞ্চল: ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কাপেং ফাউন্ডেশনসহ ছাত্র, যুব, নারী, অধিকারকামী ও আদিবাসী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে দেশব্যাপী আদিবাসীদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমতল আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে গণ-মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

ঢাকায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি জননেতা পংকজ ভট্টাচার্য এবং পাশে অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

মানববন্ধনে সংহতি বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স, জনউদ্যোগের সমন্বয়কারী তারেক মিঠুল, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য দীপায়ন খীসা, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চৈতালী ত্রিপুরা, কাপেং ফাউন্ডেশনের হিরন মিত্র চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো ও রিপন চন্দ্র বানাই, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মানিক সরেন, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের প্রতিনিধি শরীফা নাজনীন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর সভাপতি কেরিংটন চাকমা, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক মূর্ছনা মানকিন, বাগাছাসের সভাপতি অলীক মুর্ঘ, গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক টনি চিরান প্রমুখ ব্যক্তিগণসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সদস্য ও কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা।

প্রবীন রাজনীতিক পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ বছর অতিবাহিত হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর এই ১৮ বছরে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া পাহাড়ী আদিবাসীদের সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করে পার্বত্যবাসীদের যেন সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয়া না হয়। আদিবাসীরা যদি ন্যায়সংগতভাবে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যৌক্তিক দাবি করে তবে তা মেনে নেয়া সরকারের কাজ। আবার এই সরকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে, আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। অথচ এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকারের উচিত তার প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা।

অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল বলেন, মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট ভূমির সংকট থেকে শুরু হয়। আর এই ভূমির সমস্যা আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা। তিনি বলেন, মর্যাদা নিয়ে, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি নিয়ে প্রকট সমস্যা নিয়ে যে আদিবাসীরা বেঁচে আছেন সরকারের উচিত সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি দেয়া। মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে প্রফেসর কামাল পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি সরকারের কাছে জানান।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছে তারা তিন দফায় ক্ষমতায় আছেন অথচ চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি উল্লেখ করে তিনি অতিসত্বর চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানান। এছাড়া ভূমি কমিশনের কাজ নতুন ভাবে শুরু করার জন্যেও তিনি সরকারের কাছে আহ্বান করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীন ও পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের কথা সরকার বিবেচনায় রাখবেন।

দীপায়ন খীসা বলেন, বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম থেকে রাংগামাটি হয়ে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার দুদুকছড়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে এক বিশাল গণ-মানববন্ধন এবং সমতল অঞ্চলে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় আদিবাসীদের একযোগে মানববন্ধন সরকারের কাছে আদিবাসীরা বার্তা দিচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সমতল আদিবাসীদের ভূমি কমিশন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

পল্লব চাকমা বলেন, সরকার সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি উদ্ধারের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের জন্য এভাবে নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রদান করলেও বিগত ৭ বছরে এ বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে সরকারি উদ্যোগে তথাকথিত ইকো-পার্ক, জাতীয় উদ্যান, সাফারী পার্ক, সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ইত্যাদি নামে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের চিরায়ত ভূমি অধিকার খর্ব করে আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অপরদিকে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল করে চলেছে। তাই সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে" মর্মে অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বিশেষ করে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের পুনর্বাসন, ভূমি সমস্যা সমাধান, বেসামরিকীকরণ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

সমতলের বিভিন্ন জেলা: বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন ও দেশের নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার শাহবাগসহ, সাতক্ষীরা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, টাঙ্গাইল, নওগা, রাজশাহী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর জেলা ও উপজেলায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি বিমল চন্দ্র রাজোয়াড়ের সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালীন অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আন্দ্রিয়াস বিশ্বাস, আদিবাসী যুব পরিষদ রাজশাহী জেলা কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক উপেন রবিদাস, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) হেমন্ত মাহাতো।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার আয়োজনে কালেক্টরেট চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌরাস্তা মোড়ে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করে। নাটোর প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নরেশ উরাও, প্রভাতী বসাক, কালিদাস রায়, কবীর সাহা প্রমুখ।

সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনের কর্মসূচিতে আদিবাসীরা ছাড়াও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। মানববন্ধন চলাকালে আদিবাসী ফোরামের সিলেটের বিভাগীয় সভাপতি গৌরাঙ্গ পাত্রের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী নেত্রী জেসলিনা পলংয়ের সঞ্চালনায় সমাবেশে

ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা এন্ড্রু সলমার, টিডব্লিউএএসের সভাপতি দানেশ সাংমা, খাসী স্টুডেন্ট ইউনিয়নের (কেএসইউ) সহসভাপতি লভিংসন পঃস্না বক্তব্য দেন। আদিবাসীদের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, উদীচী সিলেটের সভাপতি এ কে শেরাম, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম, সিলেটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আল-আজাদ, বাসদ সিলেটের সমন্বয়ক আবু জাফর, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সিকান্দর আলী, উন্নয়নকর্মী লক্ষ্মীকান্ত সিংহ ও মানবাধিকার কর্মী ইন্দ্রানী সেন।

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আদিবাসী ছাত্র পরিষদের আয়োজনে প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচি পালিত হয়। সেখানে স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন ও পার্বত্য চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি ছাড়াও আদিবাসীদের হত্যা, নির্যাতন ও ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি পরিমল কুমার মাহাতের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ, মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর হোসেন ও বাসদ নেতা আব্দুল কুদ্দুস।

খাগড়াছড়িতে প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাধা প্রদান ও হামলা: খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসন মানববন্ধন করার অনুমতি দেয়নি। ফলে প্রশাসন খাগড়াছড়ি সদরে মানববন্ধন আয়োজনে বাধা প্রদান করে এবং মানববন্ধনে আসা লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এছাড়া মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি ইউনিয়ন ও মহালছড়ি সদরে বাধা প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, মহালছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে জনৈক লেফটেনেন্ট- এর নেতৃত্বে একদল সেনা কর্তৃক মাইসছড়ির ম্যাজিস্ট্রেট পাড়া ও নুনছড়ি পাড়ার মানববন্ধনে আসা লোকদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বেধড়ক মারধর করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। এতে ৯ জন আহত হয় এবং একজনকে ধরে নিয়ে থানায় কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়। আহত ব্যক্তিদের নাম হল- অংসিং মারমা (২৩), রামরা সু মারমা (২৭), কংসাই মারমা (৩০), উজাই মারমা (২২), অংজ মারমা (২৮), রামরা ফ্রাঁই মারমা (২৭), অংথোয়াই মারমা (২৪), কিংসা মারমা (২৩), উচিংহ্লা মারমা (২১)। মহালছড়ি সদরেও পুলিশ কর্তৃক ব্যানার ও ফেস্টুন কেড়ে নেওয়া হয়। প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বাহিনীর এ ধরনের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক বাধা প্রদান ও মানববন্ধনে আসা লোকজনের উপর নির্যাতন করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল) ও সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে সংবাদ সম্মেলন: গণ-মানববন্ধনে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক অনুমতি না দেয়া এবং বাধাদানের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল) ও সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ সেদিন সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে তিন সংগঠনের পক্ষে অধ্যাপক বোধিসত্ব চাকমা লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ইউ কে জেন, অধ্যাপক সুধীন কুমার চাকমা, অধ্যাপক মধুমঙ্গল চাকমা, সদর উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যান বিউটি রানী ত্রিপুরা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

খাগড়াছড়ি মানববন্ধনে পুলিশ ও সেনা সদস্যদের বাধা দানের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক বোধিসত্ত্ব চাকমা। পাশে অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ইউ কে জেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, ১৫ দিন পূর্বে আবেদনপত্র জমা দেয়া হলেও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল সন্ধ্যার দিকে "মানববন্ধনের অনুমতি দেয়া হবে না" বলে নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ানকে মহোদয়কে টেলিফোনে জানানো হয়। মানববন্ধনের মতো এই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচি আয়োজনে অনুমতি প্রদান না করা সংবিধানে স্বীকৃত সভা-সমাবেশের অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার তথা রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী ও বরখেলাপ। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় বাধা প্রদান করা না হলেও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের এই অনুমতি না দেয়া এবং মানববন্ধন আয়োজনে বাধা প্রদান করা বাড়াবাড়ি ও গণবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এটা খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী আচরণ বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

স্থানীয় প্রশাসনের আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সাপেক্ষে সারাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হলেও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলায় অনুমতি না দেওয়া ও বাধা প্রদান করার মূল উদ্দেশ্যেই হলো খাগড়াছড়ি জেলাবাসীদেরকে তাদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং দমন-পীড়নের মাধ্যমে জেলাবাসীর উপর অব্যাহতভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী দলের গঠিত সরকার হিসেবে, সর্বোপরি "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে" এবং "আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণসহ ভূমি কমিশন

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

আপামর জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ক্ষোভের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি পালিত

অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি, অসহযোগ আন্দোলনের নতুন ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা

গত ২ ডিসেম্বর ২০১৫ একদিকে ব্যাপক উদ্দীপনা, সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, অপরদিকে ক্ষোভের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে রাঙ্গামাটি জেলা সদরসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে, ঢাকা ও চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ঐদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা সদরস্থ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে গণসঙ্গীত অনুষ্ঠান ও বিশাল গণসমাবেশ এবং রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় জনসংহতি সমিতির উপজেলা শাখার উদ্যোগে গণসমাবেশ এর আয়োজন করা হয়। এছাড়া জনসংহতি সমিতির সংশ্লিষ্ট শাখার উদ্যোগে বান্দরবান পার্বত্য জেলাসদরে ও বান্দরবান জেলাধীন সকল উপজেলায় চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে গণসমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার ইনষ্টিটিউটে ও চট্টগ্রামে মুসলিম হলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত গণসমাবেশে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আগামী ১লা জানুয়ারি ২০১৬ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে চলমান অসহযোগ আন্দোলন আরও জোরদার করার লক্ষে ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সমিতির পক্ষে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

রাঙ্গামাটির গণসমাবেশে অংশগ্রহণকারী মানুষের ঢল

জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলছে, সরকার যদি এগিয়ে না আসে তাহলে এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আগুন জ্বলবে, অশান্ত হয়ে উঠবে এই পার্বত্য অঞ্চল ঃ সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) 'চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলছে' বলে অভিযোগ করে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সরকার যদি এগিয়ে না আসে তাহলে এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আগুন জ্বলবে, অশান্ত হয়ে উঠবে এই পার্বত্য অঞ্চল'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় উদ্যোগে 'চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করুন'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঐদিন সকাল

১০:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরের জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি ফজলে হোসেন বাদশা এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী কে এস মং মারমা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শ্রী উদয়ন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতি সুপ্রভা চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। গণসমাবেশ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সজীব চাকমা ও জলিমং মারমা। সকাল প্রায় ৯:৩০ টার দিকে গণসমাবেশে জমায়েত শুরু হলে প্রায় ১০:০০ টার মধ্যে জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ কানায় কানায় ভরে যায়। এরপরও একের পর এক বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসতে থাকলে সমাবেশে আগত জনগণ পার্শ্ববর্তী খালি স্থানসহ রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কে অবস্থান গ্রহণ করে। এতে জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ সংলগ্ন রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের অন্তত এক কিলোমিটার এলাকা জনসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে প্রায় ৫ ঘন্টাব্যাপী শহরের ব্যস্ততম রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ধারনা করা হয়, কমপক্ষে পঞ্চাশ হতে ষাট হাজার মানুষ গণসমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

গণসমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে সন্তু লারমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আজ অচলাবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে। চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলছে। একদিকে ইসলামীকরণ, অন্যদিকে সামরিকীকরণ–এই দুই ষড়যন্ত্রের মধ্যস্থলে আজকে জুম্ম জনগণকে তিলে তিলে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বিপর্যস্ত ও নিরাপত্তাহীন জীবন নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আজকেও স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা দেখি সেই বৃটিশের মত, পাকিস্তানের মত একই কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে বিরাজ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে এটা বাস্তব যে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে ৪৪ বছর ধরে এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সেনাশাসন চলছে। বাংলাদেশের কোথাও কোন অঞ্চলে এইভাবে সেনাশাসন নেই, সেনাবাহিনীর কাছে এইভাবে কোন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়া হয়নাই। আজকে সেই বাস্তবতা এখানে আছে।... আজকে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নাই। জিয়াউর রহমান সরকারের আমল থেকে এরশাদ সরকার পর্যন্ত ৫ লক্ষ বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষ, ভাসমান মানুষদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে এনে সরকারিভাবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে এখানে তথাকথিত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তারও আগে এবং তারও পরে ধারাবাহিকভাবে এখানে বেআইনী অনুপ্রবেশ হয়েছে। মিয়ানমার থেকে আগত এমনকি রোহিঙ্গা মুসলমানরাও আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে তারা বসতি স্থাপন করছে, এমনকি সরকার তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে না হলেও তিন পার্বত্য জেলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পুলিশী ব্যবস্থাপনা, সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে বসতি দেওয়া হচ্ছে।'

শ্রী লারমা বলেন, 'দীর্ঘ বিশ বছর সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ আশা করেছিল যে, তারা তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করবে। আসলে জুম্ম জনগণ সেই সমস্যা থেকে বিগত ১৮টি বছরেও মুক্তি লাভ করতে পারে নাই। সমস্যার জন্ম দিয়েছে এ দেশের সরকার, এদেশেরই শাসকগোষ্ঠী। এই সমস্যা সমাধানের জন্যও তাই সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। যারা এই সমস্যার জন্ম দিয়েছে, তাদেরকে এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। আজকে সেই লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী সেই সমস্যার সমাধান দিতে চায় না, বরঞ্চ সমস্যাকে উত্তরোত্তর তারা আরও ঘনীভূত করতে চায়।'

সন্তু লারমা আরও বলেন, 'আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চাই। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত-নির্যাতিত জুম্ম জনগণ, আমরা যারা অধিকারকামী, আমরা শাসন-শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে চাই। আমরা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদের

শাসন-শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্ত হতে চাই। আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে এদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে মর্যাদা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই।' তিনি বলেন, 'আজকে এদেশের সরকার তথা এদেশের শাসকগোষ্ঠী যদি এই বাস্তবতা অনুভব করতে না পারেন, জুম্ম জনগণের আকুতি, জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি বুঝতে চেষ্টা না করেন, তারা যদি এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে না আসেন তাহলে এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আগুন জ্বলবে, অশান্ত হয়ে উঠবে এই পার্বত্য অঞ্চল। আজকে এই বাস্তবতা অনুভব করতেই হবে।'

জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও গণসমাবেশের প্রধান অতিথি সন্তু লারমা তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে চলমান অসহযোগ আন্দোলনের ১০ দফা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঘোষণা

আগামী ১লা জানুয়ারি ২০১৬ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে চলমান অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরাজমান পরিস্থিতি সাপেক্ষে নিম্নোক্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে–

১. হরতাল;

২. জলপথ, স্থলপথ, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কার্যালয় অবরোধ;

৩. অর্থনৈতিক অবরোধ;

৪. জনগণ কর্তৃক সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস বর্জন;

৫. জনগণ কর্তৃক আদালত বর্জন;

৬. ছাত্র ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জন;

৭. পর্যটন বর্জন ও অবৈধ পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন প্রতিরোধ;

৮. অবৈধভাবে জমি অধিগ্রহণ ও বেদখল প্রতিরোধ;

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ;

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী জুম্ম রাজনৈতিক দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সামাজিকভাবে বর্জন ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ।

গণসমাবেশের সম্মানিত অতিথি ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, 'শান্তিচুক্তি নিশ্চয়ই বর্ষপূর্তি পালনের জন্য স্বাক্ষর করা হয় নাই। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে, শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তি পালন করা হয়, শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন ভালোভাবে পালিত হয় না। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।' তিনি বলেন, 'এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। যে সরকারই আসুক, এই চুক্তিকে অস্বীকার করতে পারবে না। খালেদা জিয়ার সরকারও অস্বীকার করতে পারে নাই। অতএব সর্বজনস্বীকৃত এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। যারা এই পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি কর্মকর্তা থাকবেন, তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি চাকরি করতে হয় তাহলে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করবেন। কারণ এটা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত, এটা হলো রাষ্ট্রের নীতি। অতএব রাষ্ট্র, আমাদের জাতীয় সংসদ যে শান্তিচুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই শান্তিচুক্তিকে যে অস্বীকার করবে, যে বাস্তবায়ন করবে না, তাকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য করা যাবে না। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব।' তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন, 'সমস্যার সমাধান করুন। মূল প্রতিশ্রুতি যেগুলো দিয়েছেন, শান্তিচুক্তি করেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হলে অশান্তি তো হবেই। এটাই তো স্বাভাবিক।'

সংসদ সদস্য বাদশা আরও বলেন, 'যে শান্তিচুক্তি বাংলাদেশ করেছে, যারা এই শান্তিচুক্তি করেছেন তাদের একজন এই মঞ্চে আছেন, আরেকজন প্রধানমন্ত্রী আছেন। কেন এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হবে না তার কোন কারণ খুঁজে পাই না। এখানে অনেকে বলেন, এই এলাকার কিছু মন্ত্রী বলেন, এই চুক্তির ৯০ ভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে। আমি জানি মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা তোষামোদ করেন। কিন্তু এভাবে মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখা যাবে না, মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন না।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বিষয়ে জনাব বাদশা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সম্মতি নিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের পর্যটন মন্ত্রী জননেতা রাশেদ খান মেনন আদিবাসীদের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি স্পষ্টভাবে আমাকে বলেছেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্মতি ছাড়া আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন পর্যটন শিল্প করবো না।' তিনি আরও বলেন, 'একটা কথা মনে রাখা দরকার, যদি আমরা এই বাংলাদেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে, যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য রয়েছে, এটার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ, বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু অনেক জাতি এখানে বসবাস করে। তারা ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু জাতি তো বটে! তাই বলে ক্ষুদ্র ভেবে তাদেরকে তাচ্ছিল্য করার কোন অবকাশ নেই। বলতে হবে বাঙালি ছাড়াও বহু জাতির দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা ছাড়া বহু ভাষার দেশ বাংলাদেশ। এই যে বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে বাংলাদেশের সৌন্দর্য্য। এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে সোনার বাংলার রূপ। এই রূপকে পাল্টে দিয়ে বাংলাদেশকে যারা আরব ভূমি বানাতে চায় তাদের স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না, হতে দেওয়া হবে না। আমরা হতে দেব না। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি সেই কারণে।'

গণসমাবেশের বিশেষ অতিথি গৌতম দেওয়ান বলেন, 'পার্বত্যবাসী আমরা জানি চুক্তি কী অবস্থায় আছে, চুক্তির কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে সেটা আমরা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করছি। অথচ অতীতে আমরা যাদেরকে বারবার রায় দিয়েছি, যাদের আমরা বারবার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠিয়েছি, তারাই আজকে সরকারকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের পরিচয়, তারা সরকারি লোক। তারা একটা জিনিস ভুলে যায়, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। তাদেরকে একদিন ফিরে আসতে হবে, তাদেরকে সমাজে মিশতে হবে। তারা আজকে যে সমস্ত কথাবার্তা বলছে, যেভাবে আমাদেরকে, জনগণকে বিভ্রান্ত করছে শুধু দেশে নয়, বিদেশে যারা আমাদের বন্ধু তাদেরকে, সমগ্র বিশ্বকে তারা বিভ্রান্ত করছে। আমি মনেকরি, তারা আমাদের বন্ধু নয়, তারা জাতির শত্রু হিসেবে ইতিহাসে একদিন তাদের নাম লেখা থাকবে। আমি আজকে এই সভায় সবাইকে আহ্বান জানাবো–আসুন, আমরা তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করি।'

শ্রী দেওয়ান বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ক খন্ডের প্রথমেই বলা আছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এই উপজাতীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। উপজাতীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা দূরে থাকুক, বরং এই বৈশিষ্ট্য যাতে নষ্ট করা যায় তার জন্য যেভাবে ষড়যন্ত্র চলছে সেটা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করকে পারছি।' তিনি বলেন, 'আজকে তিন জেলাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন উন্নয়নের নামে, নিরাপত্তার নামে যেভাবে হাজার হাজার একর ভূমি বেদখল করা হচ্ছে তাতে আজকে আমাদের অস্তিত্ব বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আমরা জানি, বন্যপ্রাণীদের জন্য অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়, অথচ মানুষ হিসেবে জুম্মদের রক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার গড়িমসি করছে।'

বিশেষ অতিথি ড. রাহমান নাসির উদ্দিন বলেন, 'আজকে যে আমরা আদিবাসীর কথা বলছি, আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এই যে বিশাল সমাবেশ এখানে হচ্ছে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বে, রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরে, সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে এই মানুষগুলোর অস্তিত্ব নাই। কারণ ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই মানুষগুলোকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র বলে কোন কিছু নাই। জাতি একশ জন নিয়ে হতে পারে, একশ কোটি নিয়ে একটা জাতি হতে পারে। জাতিসত্তা নির্মিত হয় কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। সেই বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত খুমী, খিয়াং, লুসাই, পাংখো, বম, চাক, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা প্রত্যেকেই একেকটা স্বতন্ত্র জাতি। সুতরাং ক্ষুদ্র জাতি হিসেবে সংবিধানে যে উল্লেখ রয়েছে, এটা রাষ্ট্রের একধরনের সংখ্যাগুরুর দেমাগ বলে প্রতিফলিত হয়।

বিশেষ অতিথি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, '১৯৯৭ সালে যখন এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন সারা দেশের আদিবাসীরা আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম, যদি ঐ জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সারা দেশের আদিবাসীদের অধিকার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং তার জন্য আমরা লড়াই করবো। কিন্তু আমরা দেখছি, এখন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি।' তিনি বলেন, 'আদিবাসীদের প্রধান ইস্যু হচ্ছে ভূমি অধিকার। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধন করার কথা। সেটা কিন্তু এখনো হয়নি। ঠিক একইভাবে সারাদেশের আদিবাসীদের ভূমি প্রতিনিয়ত দখল হচ্ছে। একদিকে সরকার আদিবাসী ভূমি দখল করে, কোম্পানী দখল করে, আরেকদিকে ভূমিদস্যুরা দখল করে। এইভাবে দখল করতে করতে আজকে আদিবাসীদেরকে ভূমিহারা করা হচ্ছে, উচ্ছেদ করা হচ্ছে।'

জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পদদলিত করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়, সংগ্রাম করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেই কারণে বলতে চাই- জুম্ম জনগণকে সংগ্রাম করে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। সংগ্রাম করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা জানি যে, যে জাতি সংগ্রাম করতে জানে, যে জাতি মরতে জানে সে জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না।' তিনি বলেন, 'এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্যে যে অসহযোগ আন্দোলন চলছে সে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনে আত্মবলিদানের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য কে এস মং মারমা বলেন, 'আজকে পর্যটনের নামে জুম্মদের শত শত একর ভূমি দখল করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নীলগিরি, চিম্বুক পাহাড়, শৈলপ্রপাত, নীলাচল কমপ্লেক্স, জীবতলি লেকসাইট রিসোর্ট, আরণ্যক লেকসাইট রিসোর্ট, সুবলং রিসোর্ট, আলুটিলা, সাজেক, বাঘাইহাট, গিরিশোভা ইত্যাদি ১৫টি স্থানে যে পর্যটন গড়ে তোলা হয়েছে তার কারণে জুম্মরা তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। আলীকদম থেকে থানচি পর্যন্ত যে রাস্তাটি তৈরি হয়েছে সেই রাস্তার আশেপাশে যে পর্যটন হয়েছে সেটার কারণে ৬টি ম্রো পাড়া ইতিমধ্যে উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে। নীলগিরি হলো আমাদের ম্রো ভাইদের একটি ঐতিহ্যবাহী পাড়া, সেই পাড়ার নাম হলো কাপ্রু পাড়া। সেই কাপ্রু পাড়াকে বদলিয়ে নীলগিরি করা হয়েছে। এখানে একটি মৌজা উচ্ছেদ করে পর্যটন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আজকে এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না, আবার অন্যদিকে নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার আমাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে ছুঁড়ে দিয়েছে।'

বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক হয়রানি ও বাধা সৃষ্টির চেষ্টা

বিলাইছড়ি উপজেলা হতে অন্তত সত্তরটি ট্রলার যোগে জনগণ রাঙ্গামাটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। বোট যোগে আসার পথে বিলাইছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা বোট থামিয়ে হয়রানি করে এবং বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। জুরাছড়ি থেকে আসার পথেও শিলছড়ি সেনাক্যাম্পে বোটগুলো থামিয়ে হয়রানি করে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। অপরদিকে বান্দরবান ও রাজস্থলী থেকে আসার পথেও রাজস্থলীতে সেনাসদস্যরা বাস থামিয়ে হয়রানি করে।

বান্দরবানের সমাবেশে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অনতিবিলম্বে চুক্তির বাস্তবায়ন দাবি

একই দিন বান্দরবানের জনগণ রাঙ্গামাটির গণসমাবেশে যোগদানের পাশাপাশি বান্দরবান জেলা সদর ও জেলাধীন অন্যান্য ছয়টি উপজেলায়ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন উপলক্ষে গণসমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। দুপুর ১:০০ টায় জেলা সদরের পুরাতন রাজবাড়ি মাঠে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক উচসিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গুণেন্দু বিকাশ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহিত সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি অংথোয়াই চিং মারমা। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির স্টাফ সদস্য জ্যোতিষ্মান চাকমা (বুলবুল), মহিলা সমিতির জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক মেশৈপ্রু মারমা, জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানার সাধারণ সম্পাদক পুশৈথোয়াই মারমা, যুব সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মংএসিং মারমা (জিকো), পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উবাসিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক সুজয় চাকমা।

গণসমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। বস্তুত দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অনতিবিলম্বে এ চুক্তি বাস্তবায়ন অপরিহার্য।' নেতৃবৃন্দ, অবিলম্বে সরকার রোডম্যাপ তৈরী করে চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে পার্বত্যবাসী ও দলের নেতাকর্মীদের কঠোর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

অপরদিকে সকাল ১০:০০ টায় রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে মঙ্গলসেন তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক অংশৈমং মারমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন সভাপতি মেচিং অং মেম্বার, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি প্রীতিসেন তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। সকাল ১০:০০ টায় রুমা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে জনসংহতি সমিতির রুমা থানা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন লুপ্রু মারমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুব সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি মংস্তু মারমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য মংশৈপ্রু খেয়াং, সমিতির রুমা থানা শাখার সহ-সভাপতি ও পাইন্দু ইউপি চেয়ারম্যান ক্যসাপ্রু মারমা, যুব সমিতির রুমা থানা শাখার সভাপতি চিংসাথোয়াই মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রুমা থানা শাখার সভাপতি মংমি মারমা প্রমুখ।

সকাল ১০:০০ টায় থানচি উপজেলা সদরের বাস স্টেশন সংলগ্ন মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে জনসংহতি সমিতির থানচি থানা শাখার উদ্যোগে ক্রাপ্রু অং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য ও থানচি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান চসাথোয়াই মারমা পকচে। অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নিত্যলাল চাকমা, সমিতির থানচি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেমং প্রু মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক মংসাচিং মারমা, সদস্য সিমিওন ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের থানচি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক থুইমং মারমা প্রমুখ।

সকাল ১১:০০ ঘটিকায় লামা উপজেলার চম্পাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জনসংহতি সমিতির লামা থানা শাখার উদ্যোগে অংগ্য মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৪নং নোয়াপতং ইউপি চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য যিরমিয় ত্রিপুরা, লামা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসাম, সাংগঠনিক সম্পাদক চম্পাত ম্রো, মহিলা সমিতির লামা থানা শাখার সভাপতি উসাংপ্রু মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের

বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। সকাল ১০:৩০ টায় আলীকদম উপজেলা সদরে জনসংহতি সমিতির আলীকদম থানা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল এবং মিছিল শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে কাইনথপ ম্রোর সভাপতিত্বে এক গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়। গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির প্রবীণ সদস্য ম্রাঅং মাস্টার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক য়ানঙাং ম্রো, সমিতির আলীকদম থানা শাখার সাবেক সভাপতি মংচনু মারমা, সাবেক সহ-সভাপতি চাক্কামং মারমা, সাধারণ সম্পাদক চাথোয়াই মং মারমা প্রমুখ।

দুপুর ২:০০ টায় জনসংহতি সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে নাইক্ষ্যংছড়ি জেলা সদরে এক বিক্ষোভ মিছিল এবং মিছিল শেষে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এক গণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। চিংচামং কার্বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সহ-ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মংনু হেডম্যান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমেত তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ তঞ্চঙ্গ্যা, বাইশারী ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ঞোহ্লামং মারমা, সোনাইছড়ি শাখার সভাপতি থোয়াইংক্যচিং মারমা প্রমুখ।

ঢাকায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন ঃ একটি জাতীয় অঙ্গীকার' শীর্ষক আলোচনা সভা

চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঐদিন ঢাকায় 'জাতীয় নাগরিক উদ্যোগ' এর উদ্যোগে সকাল ১০:০০ টায় ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের সম্মেলন কক্ষে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন ঃ একটি জাতীয় অঙ্গীকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। নাগরিক উদ্যোগের আহ্বায়ক, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক মেসবাহ কামাল, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসনে, এএলআরডি-র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইডি-র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মেদ খান এবং নাগরিক উদ্যোগের পক্ষে দাবিনামা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, 'সরকার বলছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অধিকাংশ ধারা তারা বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু চুক্তির প্রধান ও মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। মূলধারা যদি অবাস্তবায়িত থেকে যায়, তাহলে অন্যান্য ধারাগুলো বাস্তবায়নের কোন মূল্য থাকে না'। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আসলে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে মিথ্যাচার করছে সরকার।' নেতৃবৃন্দ বলেন, 'যখন কোন সরকার চুক্তি করে তা বাস্তবায়ন করাও সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।'

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, 'ভূমি অধিকারসহ চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। সেখানে এখনো সেনা কর্তৃত্ব রয়েছে।' নেতৃবৃন্দ বলেন, 'চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া মূলত অকার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছে। সরকারকে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।' নেতৃবৃন্দ বলেন, 'চুক্তির মূল কথা বা সারবস্তু ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটা নিয়ে কোন ধরনের বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।' নেতৃবৃন্দ বলেন, 'বাঙালি শাসকগোষ্ঠীও উপনিবেশবাদী। তাই তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি উপনিবেশ হিসেবে দেখতে চায়। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরও এই ধারা চলে এসেছে।'

চট্টগ্রামে চুক্তির বর্ষপূর্তিতে ড. অনুপম সেন

পাহাড়িদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে একই দিন গণসঙ্গীত ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা তাপস হোড়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জনাব আবু সুফিয়ান, জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের

সভাপতি শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন খালেদ সেলিম, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতা এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মহিউদ্দিন, প্রভাষক বসুমিত্র চাকমা, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জুলন ধর, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনন্দ বিকাশ চাকমা, নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারুক হোসেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা প্রমুখ।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ড. অনুপম সেন বলেন, 'সদিচ্ছা থাকলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কোন কঠিন বিষয় নয়। পাহাড়িদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা ও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে। চুক্তি হওয়াতে পাহাড়ে দীর্ঘ সময়ে চলমান সংঘর্ষ সমাধান হয়েছে বটে কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় হতাশা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়িদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, 'চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য পাহাড়ি মানুষের যে আন্দোলন-সংগ্রাম, এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।' তিনি জনসংহতি সমিতির চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে ড. অনুপম সেন বলেন, 'মাঠে-ঘাটে, রাস্তায় যখন যেখানে আমাকে প্রয়োজন হবে আমি আপনাদের সংগ্রামে থাকবো। সংগ্রাম করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করে নিতে হবে। আপনারা সংগ্রাম ছাড়বেন না, সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। আমরা আপনাদের সাথে থাকবো।'

প্রধান আলোচক ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক বলেন, 'ভূমি সমস্যা পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করে এর যথাযথ কার্যকরকরণ খুবই জরুরী।' তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা তাই রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার বিধান চুক্তিতে, আইনে থাকলেও বাস্তবে দেখলে পাহাড়িরা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু।'

এছাড়া নেতৃবৃন্দ পার্বত্য অঞ্চলে চলমান সেনাশাসনের বিরোধীতা করে সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো অতি শীঘ্রই যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে সময়সূচি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সরকারি দল ও বিভিন্ন মহলের উদ্যোগে চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন

প্রধানমন্ত্রী এ চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেইঃ গওহর রিজভী

বিভিন্ন স্থানেও সরকারি দলের উদ্যোগে চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি পালনের খবর পাওয়া গেছে। সরকারি দলের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পৌরসভা চত্বরে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। ড. গওহর রিজভী বলেন, 'শুধু এক পক্ষ চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ করলে হবে না। চুক্তির পক্ষের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এ চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

অপরদিকে বান্দরবান জেলা পরিষদের উদ্যোগে বান্দরবান সদরে ও খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সদরে চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ-র বাড়ি বরিশালে স্থানীয় আওয়ামীলীগের উদ্যোগেও চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন করার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া খাগড়াছড়িতেও সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা আয়োজন করার খবর পাওয়া গেছে।

ঢাকায় সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান

চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি পালন উপলক্ষে ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ঢাকার ডেইলি স্টার ভবনে এ এস মাহমুদ সেমিনার হল-এ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও কাপেং ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তিঃ স্থানীয় জনগণের অধিকার ও বাস্তবতা' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, চাকমা সর্কেলের চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, সাবেক তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমা। সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অপরিহার্য।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ ঢাকায় আয়োজিত জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

রাজভিলায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা ছাত্রী শ্লীলতাহানির শিকার

গত ২৭ নভেম্বর ২০১৫ বিকাল আনুমানিক ৫.৩০ টায় বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ৫নং রাবার বাগান ওয়েসাআগা এলাকায় অজ্ঞাতনামা তিনজন সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক এক মারমা ছাত্রী শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে। জানা যায়, এসএসসি পরীক্ষার্থী (২০১৬ সাল) তিনজন মারমা ছাত্রী (তাইনখালী অনাথ আশ্রম হতে) বাঙালহালিয়া বাজার থেকে স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় বই ও ব্যবহারিক খাতা কিনে ৫নং রাবার বাগান হয়ে অনাথ আশ্রমে ফিরছিল। ফেরার পথে ইসলামপুর ও ঝাংকার মাঝামাঝি ওয়েসাআগা এলাকায় পৌঁছলে মুখে গামছা বাধা অজ্ঞাতনামা তিনজন সেটেলার বাঙালি তাদের পিছু নেয়। ছাত্রীরা ঘটনা আঁচ করতে পেরে দৌড়ে পালানোর সময় একজন ছাত্রী পা পিছলে পড়ে গেলে সেটেলার বাঙালিরা ওই ছাত্রীকে ধরে শ্লীনতাহানি করে। অন্য দু'জন ছাত্রী পালিয়ে এসে ঝাংকা গ্রামবাসীকে ঘটনাটি জানালে রাত প্রায় সাড়ে সাতটায় জঙ্গল থেকে শ্লীলতাহানির শিকার ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি এবং কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

স্বাধীনতা দিবসে কাপ্তাইয়ে চারজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা কিশোরী ধর্ষিত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ দেশের স্বাধীনতা দিবসে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক জুম্ম ছাত্রী (১৪) কাপ্তাই নৌ বাহিনী সড়কের স্বাগতম ভবন এলাকায় চারজন সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। জানা যায়, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে দোকাইয়া গ্রামের মারমা কিশোরীটি কাপ্তাই নৌ বাহিনী সড়কে স্বাগতম সড়ক এলাকায় এক আত্মীয় বাসায় থেকে কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার দিন প্রতিবেশি এলাকা থেকে আগত তার স্কুলের সহপাঠি উথাই চিং মারমার সাথে কাপ্তাই শহীদ স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার উদ্দেশ্যে হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই সেটেলার বাঙালিরা হঠাৎ সেখানে হাজির হয় এবং উথাই চিং মারমাকে পেটাতে আরম্ভ করে। তারপর তারা ঘটনার শিকার ঐ মারমা কিশোরীকে জোর করে পার্শবর্তী জঙ্গলে নিয়ে একে একে ধর্ষণ করে।

ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে কাপ্তাই থানায় এক মামলা দায়ের করেন। ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তরা হলো- মো. জামাল (২৬) পিতা মো. আক্তার, ঠিকানা-স্বাগতম ভবন এলাকা; মো. সুমন (১৯) পিতা মো. ইসহাক; মো. কামাল (২৫) পিতা জামায়ার এবং শাহ আলম (২৫)। পরে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা কিশোরী গণধর্ষিত

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ দুপুর ১২:০০ টায় খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৬ বছরের এক ত্রিপুরা কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা যায়, ঘটনার সময়ে ওই কিশোরী লাম্বাছড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে মাইসছড়ি বাজারে যাচ্ছিল। সেদিন ছিল মাইসছড়ি হাটবার। দীবিপাড়ার সেটেলার গুচ্ছগ্রাম ৫ একর এলাকায় পৌঁছলে সিলেট থেকে আগত তক্ষক ব্যবসায়ী ৪ জন বহিরাগত বাঙালি ওই কিশোরীকে পথে একা পেয়ে জঙ্গলে ধরে নিয়ে জোরপূর্বক পালাক্রমে গণধর্ষণ করে। পথচারীদের কথা শুনে ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা ওই কিশোরীকে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে পালিয়ে যায়। পরে পথচারী কয়েকজন বাঙালি অজ্ঞান অবস্থায় ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে স্বজনদের খবর দেয়। পরে ওই কিশোরীর ভাষ্য মতে দীবিপাড়া সেটেলার গুচ্ছগ্রামের ৫ একর এলাকার সেটেলার বাঙালিরা দু'জন ধর্ষককে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীর পিতা কলাচিং ত্রিপুরা বাদী হয়ে মহালছড়ি থানায় (মামলা নং-২) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯(৩) ধারায় মামলা দায়ের করেছে। অনুপ্রবেশকারী ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা হল- মো: জামাল হোসেন (২৬), পিতা: কলন্দর, গ্রাম: মায়েরকুল, থানা: চাতক, জেলা: সুনামগঞ্জ; এবং মো: এরশাদ আলী (৩১), পিতা: হরমুজ আলী, থানা: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ।

লক্ষ্মীছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা শিশু ধর্ষিত

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ৯.০০ টায় খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরের হাতিছড়া গ্রামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক চার বছরের এক মারমা শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ মারমা কন্যাশিশুকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষক ওই সেটেলার কিশোর জোর করে তাদের বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ওই শিশুর মা নাইম্রাচুন মারমা নদী থেকে পানি নিয়ে বাড়িতে আসার সময় বিজয় দেবদের বাড়ির দরজার সামনে দেখতে পায়। তাই সে জোর করে দরজা খুললে ঘরের ভিতরে বিজয় দেবসহ তার মেয়েকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পায়। পরে গ্রামবাসীসহ শিশুটিকে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত ডাক্তার ধর্ষণের শিকার ওই শিশুটিকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে এ ঘটনার পর পরই ধর্ষকের পিতা সাধন দেব তার ছেলে বিজয় দেবকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী সাজিয়ে ভর্তি করার জন্য নিয়ে আসে। এ সময়ে ধর্ষকের পিতা সাধন দেব কর্তব্যরত ডাক্তারকে জানায় যে, তার ছেলেকে হাত-পা বাঁধা ও

আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় গ্রামের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পাওয়া যায় এবং চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার সুমন কল্যাণ চৌধুরী বিজয় দেবকে পরীক্ষা করে সুস্থ এবং চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বলে জানালে সাধন দেব ডাক্তারের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। ফলে ডাক্তার সুমন কল্যাণ চৌধুরী সাধন দেবের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীছড়ি থানায় প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেন। অপরদিকে ধর্ষকের পিতা সাধন দেবও তার ছেলে চিকিৎসা পাচ্ছেনা ও তার ছেলের উপর অত্যাচরের বিচার পাবার জন্য লক্ষ্মীছড়ি থানায় মামলা করতে যায়। কিন্তু পুলিশ সাধন দেবকে থানায় আটকে রাখে। ঘটনার দিন বিকালে ধর্ষণের শিকার ওই শিশুর পিতা রামপ্রুসাই মারমা বাদী হয়ে লক্ষ্মীছড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন। ধর্ষক বিজয় দেবকে (১৩) পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠায়।

সাজেকের গঙ্গারামমুখে পুলিশ কর্তৃক চাকমা মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারামমুখ গ্রামের এক চাকমা মেয়েকে মো: সরোয়ার নামে বাঘাইহাট পুলিশ ফাঁড়ির এক পুলিশ ধর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়েছে। মেয়েটি উক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে সাজেক থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যকে হাতকড়া পরিয়ে রাঙ্গামাটি সদরে আনা হয়েছে বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেদিন বিকাল আনুমানিক ৪.০০ (চার) ঘটিকার সময় বাঘাইহাট পুলিশ ফাঁড়ি হতে মো: সরোয়ার ভাড়া করা মোটর সাইকেল যোগে গঙ্গারামমুখের উজোবাজারের পুলিশ পোষ্টে যাচ্ছিল। উজোবাজারে না থামিয়ে প্রায় ২৫০/৩০০ গজ দূরত্বে গিয়ে সারোয়ার মোটর সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। মো: সরোয়ার ভিকটিমের বাড়িতে উঠে পড়ে। ভিকটিমের কাছ থেকে সরোয়ার পানি চাইলে ভিকটিম যখন পানি দিচ্ছিলেন, তখনই ধর্ষণের উদ্দেশ্যে সরোয়ার তাকে হাত ধরে টেনে আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণের চেষ্টা করে। একপর্যায়ে রিপা চিৎকার করতে পারলে গ্রামের আশপাশের লোকেরা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। ততক্ষণে সরোয়ার পালিয়ে যেতে থাকে। পালানোর সময় এক গ্রামবাসী সরোয়ারকে ধরার চেষ্টা করে। পরে সরোয়ার উজোবাজারের পুলিশ পোষ্টে আশ্রয় নেয়। তখন জুম্মরা সরোয়ারের কৃত অপকর্মের কথা পুলিশ পোষ্টে জানায়। ঘটনার কথা জানাজানি হলে সাজেক মাচালং থানার অফিসার ইনচার্জ মো: নুরুল আনোয়ার উজোবাজার পোষ্টে চলে আসেন এবং সরোয়ারকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে থানায় নিয়ে যান।

পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মো: সারোয়ারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গ্রামবাসীরা উজোবাজারে এক মানববন্ধন করেন। উক্ত মানববন্ধনে এলাকার মুরুব্বী যারা বক্তব্য রেখেছেন, তাদেরকে বাঘাইহাট আর্মী জোনের জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আলী হায়দার সিদ্দিকি ডেকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, পরবর্তীতে যদি এরকম মানববন্ধন করা হয়ে থাকে তাহলে কাউকে কিছু না বলে সরাসরি বেঁধে নিয়ে আসবে।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

বরকলে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের জমি বেদখল অব্যাহত

গত ৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু ও বরকলে বসবাসরত সেটেলার বাঙালিরা বরকল ইউনিয়নের দু'টি গ্রামে জুম্মদের রেকর্ডীয় জায়গা বেদখল করার চেষ্টা করছে বলে জানা যায়। ৮ নভেম্বর থেকে ২০/২৫ জন সেটেলার বাঙালি বরকল ইউনিয়নের কুরকুটিছড়ি মৌজার কুসুমছড়ির নিবাসী চন্দ্রলাল চাকমা (৭২) পিতা- সুতবান চাকমা এর রেজিঃ ৩.৮.১৯৬৮ তারিখ দাগের ৫.০০ (পাঁচ) একর জায়গা এবং সুনীতি জীবন চাকমা (৬৮) পিতা- নমদ্বীপ চন্দ্র চাকমার রেজিষ্ট্রিভুক্ত ৩.০০ (তিন) একর জায়গার জঙ্গল কাটতে শুরু করে। চন্দ্রলাল চাকমার বাগানের বড় বড় আম গাছ কেটে দেয় বলে জানা যায়।

এছাড়া সেটেলার বাঙালিরা একই ইউনিয়ন ও একই মৌজার চাক্কোয়াতলী নিবাসী বিজয় চন্দ্র চাকমা পিতা- মৃত ডাক্কোয়া চাকমা এর রেজিষ্ট্রিভুক্ত, আর-৪৯ মূলে ৩.০০ (তিন) একর জমিতে রোপণকৃত ৪/৫ বৎসর বয়সী সেগুন গাছ কেটে ধ্বংস করে। বিনয় রঞ্জন চাকমা (৮০) পিতা- মৃত দেবজয় চাকমা এর আর-৬৮ মূলে ৩.৫০ একর জমি এবং ৩) সমরেন্দ্র লাল চাকমা (৭২) পিতা মৃত যুবলক্ষ চাকমা এর আর-৯৩ মূলে ৩.০০ একর ফলজ (আম, লিচু, আমলকি) বাগান কেটে ধ্বংস করে দেয়।

সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হচ্ছে (১) মোঃ আবু তাহের, পিতা-মৃত মোঃ মিয়া, বাজার টিলা, ১৭ নং ঘনমোর মৌজা; ২) মোঃ মজিত, পিতা- মৃত ইছাক মিয়া, সাং-ঐ; (৩) মোঃ কাইয়ুম, পিতা-মৃত ইছাক মিয়া, সাং-ঐ; (৪) মোঃ রহিম পিতা- রফিক মিয়া, সাং-ঐ; (৫) মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা- মোঃ মনোহর আলী, সাং- কুরকুটিছড়ি গুচ্ছগ্রাম, কুরকুটিছড়ি মৌজা, বরকল উপজেলা; (৬) মোঃ শাহজাহান মিয়া, পিতা-মৃত আমিনুল্লা ভান্ডারী, গ্রাম- চাক্কোয়াতলী, বরকল ইউনিয়ন, বরকল উপজেলা এবং (৭) মোঃ শাহ কামাল পিতা-মৃত আমিনুল্লা ভান্ডারী, সাং- ঐ।

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি-রাঙ্গামাটি লঞ্চে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের হামলা

গত ১৪ নভেম্বর ২০১৫ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টার সময় বাঘাইছড়ি উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের দীঘলমুখ নামক স্থানে বাঘাইছড়ি হতে রাঙ্গামাটি গামী বিরতিহীন লঞ্চের উপর লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী ইউনিয়নে বসবাসরত ৩৫/৪০ জনের একদল সেটেলার বাঙালি এক ঝটিকা হামলা চালায়। হামলায় বাঙালিরা লাঠি, বৈঠা ও বল্লম ব্যবহার করে থাকে। এ হামলায় চারজন জুম্ম গুরুতর আহত হয়। আহত ব্যক্তিরা হলেন- ১) বিশিকা চাকমা (৪৫) স্বামী- সুমতি চাকমা, গ্রাম-ত্রিপুরাপাড়া, তুলাবান, বাঘাইছড়ি; ২) করুণা চাকমা (২৪) পিতা- ইন্দ্র কুমার চাকমা, গ্রাম-মধ্যম পাবলাখালী, বাঘাইছড়ি; ৩) জ্যোতির্ময় চাকমা (৩১) পিতা- সুভাষ বসু চাকমা, গ্রাম-জীবতলী হেডম্যানপাড়া, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা; ৪) সুভডি চাকমা (৩৩) পিতা- করুণাময় চাকমা, গ্রাম-কুসুমছড়ি, বরকল উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। উল্লেখ্য যে, ঘটনার স্থান ৯ নং বিজিবি ক্যাম্পের অনতিদূরে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ৪ নভেম্বর ২০১৫ লংগদু উপজেলার গুলশাখালী ইউনিয়নে বসবাসরত ৪/৫ জনের একদল সেটেলার বাঙালি জেলে বাঘাইছড়ি উপজেলার পূর্ব হিরাচর নামক স্থানে মাছ ধরতে যায়। এ সময় গ্রামের তবপ্রিয় চাকমা (৫০) পিতা-মৃত মৃত্যঞ্জয় চাকমা মাছ কিনতে গেলে বাঙালি জেলেরা বিক্রি করতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে বাঙালি জেলেদের সাথে তবপ্রিয় চাকমার কথা কাটাকাটি হলে একপর্যায়ে সেটেলার জেলেরা তবপ্রিয় চাকমার উপর চড়াও হয়। এ সময় গ্রামবাসীরা গিয়ে তবপ্রিয় চাকমাকে উদ্ধার করে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি-বাঙালি মুরুব্বীরা মিলে গত ১৩ নভেম্বর ২০১৫ আমতলীতে এক সালিশের অয়োজন করে। এ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের সর্বসম্মতিক্রমে জেলেদের নিকট হতে ১,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে তবপ্রিয় চাকমার অনুকূলে আদায় করে দেয়া হয় এবং তবপ্রিয় চাকমার কাছে জেলেদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। তবপ্রিয় চাকমা এ সময় ১৫০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা ফিরিয়ে দেন। বিষয়টা সেখানে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও সেটেলার বাঙালিরা ১৪ নভেম্বর জুম্ম যাত্রীদের উপর হামলা করে। সেদিন তারা পানিতে জাল ফেলে বিরতিহীন লঞ্চকে গতিরোধ করে। লঞ্চের চতুর্দিক হতে "পাবলাখালীর লোকেরা বাঙালিদেরকে মাছ ধরতে দিচ্ছে না, ধরে ধরে জবাই কর" ইত্যাদি উত্তেজনা ছড়িয়ে লঞ্চের নিচ তলায় বসা জুম্মদেরকে যাকে পেয়েছে তার উপর হামলা চালায়।

গত ১৫ নভেম্বর ২০১৫ আমতলী বাজারে আরও এক সভা ডাকা হয়। উক্ত সভায় বলা হয় যে, যদি এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে গুলশাখালী চেয়ারম্যানসহ সকল আসামীদেরকে থানায় সোপর্দ করবেন। ঘটনায় আহতদেরকে মাইনী জোনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত বাঙালি মুরুব্বীদের মুখ থেকে এ ঘটনার জন্য শুধু ক্ষমা চাওয়া হয়। কিন্তু এ ঘটনার জন্য কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

নানিয়ারচরে ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ফলজ বাগান কর্তন

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ দুপুর প্রায় ১:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার নানিয়ারচর ইউনিয়নের বগাছড়ি এলাকায় কোন প্রকার পূর্ব জের ও উস্কানি ছাড়াই দুই সেটেলার বাঙালি নবীন তালুকদার পাড়ার প্রতিরঞ্জন চাকমা (৩৫), পীং- বীর মোহন চাকমা নামের এক জুম্ম গ্রামবাসীর মালিকানাধীন ৪৯টি কাঠাল গাছ, ৩০টি সেগুন গাছ, ২টি কমলা গাছসহ বেশ কিছু কলা ও পেঁপে গাছ কেটে দেয়। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, তার

ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যেই সেটেলার বাঙালিরা উস্কানিমূলক এই ঘটনা ঘটায়। উল্লেখ্য, পূর্বেও নানিয়ারচর এলাকায় সেটেলার বাঙালিরা একাধিকবার এধরনের উস্কানিমূলক ঘটনা ঘটিয়েছে। ফলজ গাছের ক্ষতিসাধনকারী দুই সেটেলার বাঙালি হল– (১) মোঃ রাব্বী (১৮), পীং-রাজ্জাক, বগাছড়ি পুনর্বাসন, ৩নং বুড়িঘাট ইউনিয়ন ও (২) মোঃ সুমন (১৯) পীং-মোঃ মোস্তফা, সাং-ঐ।

তারাছার ফাক্ষ্যং পাড়ায় জুম্ম গ্রামবাসীর উপর সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলাধীন তারাছা মৌজার ফাক্ষ্যং পাড়ার জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে এক জুম্ম পরিবারের উপর ভূমি দখলকারী সেটেলাররা হামলা চালায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত মৌজায় ফাক্ষ্যং পাড়াটি ১৯২৯ সাল থেকে মারমা পাড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালে চাইথোয়াইউ মারমা নামে ৩.০০ (তিন) একর ২য় শ্রেণির জমি বন্দোবস্তি লাভ করেন। উক্ত জমির উপর চাইথোয়াই মারমাকে পাড়ার প্রধান (কার্বারী) হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে ২১টি মারমা পরিবার সমন্বয়ে এই পাড়াটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮০ দশকের পরে সমত আলী নামে এক বাঙালি উক্ত পাড়াতে ছোট একটা ভাঙ্গা ঘরে ক্ষেতি-খামার চাষের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সে দিনমজুরী করত। ৩-৪ বৎসর থাকার পর এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে সে পাড়াবাসীদের অনুমতি নিয়ে বসবাস শুরু করে। উক্ত পাড়াতে অনেক দিন বসবাসের পর ২০১৩ সালের পাড়াবাসীকে সে জানায়, এ পাড়া জায়গাটি তার নামে ১৯৮৬ সনে ২.০০ (দুই) একর ২য় শ্রেণির জমি বন্দোবস্তি করেছে। তাই মারমা গ্রামবাসীরা বসবাস করতে চাইলে জমি ভাড়া দিতে হবে অথবা এ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিষয়টি এলাকাবাসীকে হতভম্ব ভাবিয়ে তুলে এবং বিষয়টি নিরসনের জন্য এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে অনেকবার বৈঠক হয়।

২০১৩ সালে শেষ নাগাদ রোয়াংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সার্ভেয়ার পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানের জন্য নামমাত্র লোক দেখানো উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে পাড়াবাসী পাড়া ভূমির রক্ষার্থে আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করলে এ বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ঐ পাড়াতে সমত আলী এক পরিবার হলেও পার্শ্ববর্তী ছাইংগ্যা দানেশ পাড়ার প্রায় চার শতাধিক বাঙালি পরিবারের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এবং প্ররোচণায় সমত আলী পরিবার প্রায় সময় আক্রমণাত্মক আচরণ, জেল-হাজতের ভয়-ভীতিসহ পাড়াবাসীদেরকে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে সন্ত্রস্ত করে তুলছে।

তারই অংশ হিসেবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সকাল ৮.৩০ ঘটিকার সময় পাড়ার ভিতরে নতুন আরেকটি ঘর নির্মাণের চেষ্টা করলে উক্ত পাড়ার বাসিন্দা মংক্যসিং মারমা বাধা দিলে তার উপরে আক্রমণ করে। তখন তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন মংক্যসিং মারমাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলে সমত আলীর নেতৃত্বে বাঙালিরা মংক্যসিং মারমার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনকে আক্রমণ করে। এতে ঘটনাস্থলে ১। ক্যাইমাউ মারমা (৪০), স্বামী- থুইবু মারমা, ২। পুলুমা মারমা (২৬), স্বামী- মংক্যসিং মারমা, ৩। উম্যানু মার্মা-২৮, স্বামী- পাইনুমং মারমা ও ৪। উনুপ্রু মার্মা-২৮ স্বামী-উবাহাই মারমা গুরুতর আহত হয়। বিষয়টি রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা হস্তক্ষেপে তারাছা ইউনিয়নের পুলিশ ফাঁড়ির সহায়তায় নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও এ নিয়ে মারমা গ্রামবাসীরা চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে।

মোটরসাইকেল চালকের লাশ উদ্ধারের ঘটনার জের ধরে

মাটিরাঙ্গায় জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের নির্বিচারে হামলা

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ির আলুটিলা পাহাড়ের রিছাং ঝর্ণা এলাকা থেকে এক মোটরসাইকেল চালকের লাশ উদ্ধারের পর সেটেলার বাঙালিরা মাটিরাঙ্গা বাজারে গাড়ী থামিয়ে নিরীহ জুম্ম যাত্রী ও পথচারীদের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। প্রাথমিকভাবে এ হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে দু জন আহত ব্যক্তিকে গুরুতর অবস্থায় মাটিরাঙ্গা উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মাটিরাঙ্গা উপজেলার নতুনপাড়া কাইয়াটিলা গ্রামের মো: ছালেহ আহম্মদ এর ছেলে মোটরসাইকেল চালক আজিজুল হাকিম শান্ত (২৭) নিখোঁজ হয়। সে ভাড়ায় মোটরসাইকেলে যাত্রী বহন করতো। আজিজুল হাকিম শান্ত ঘটনার দিন দুপুরে খাবার খেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। রাত ৯:০০ টায় খাগড়াছড়ি থেকে ভাড়া নিয়ে মাটিরাঙ্গা বাজারে ফিরে আসার পর নিখোঁজ হয়। সেদিন রাত ৯:০০ টার দিকে তার বাবার সাথেও ফোনে কথা হয় বলে জানা যায়। কিন্তু তারপর থেকে তার কোন হদিশ মেলেনি।

আরো জানা যায় যে, এ ঘটনায় গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ দুপুর ১২:০০ টায় সাপমারা এলাকার মাটিরাঙ্গা পাইলট মডেল হাই স্কুলের ছাত্র এসএসসি পরিক্ষার্থী ভারা চন্দ্র ত্রিপুরার ছেলে ধনমনি ত্রিপুরাকে (১৭) মাটিরাঙ্গা বাজার থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ আটক করে। জানা গেছে, আজ ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আলুটিলা পাহাড়ের রিছাং ঝর্ণা এলাকার স্থানীয়রা একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে। পরে নিখোঁজ হওয়া আজিজুল হাকিম শান্ত'র স্বজনরা গিয়ে লাশটি সনাক্ত করে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, আলুটিলা পাহাড়ের রিছাং ঝর্ণা এলাকাটি মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি মূল সড়ক থেকে আধা কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত জুম্ম গ্রামের পাশে। হত্যার পর কে বা কারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে লাশটি এই জুম্ম গ্রামের পাশে রেখে যেতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এদিকে মোটরসাইকেল চালক আজিজুল হাকিম শান্ত নিখোঁজ হওয়ার পর এবং ২১ ফেব্রুয়ারি লাশ উদ্ধারের পর

উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ হত্যাকান্ডের সাথে জুম্মদের জড়িয়ে মাটিরাঙ্গা বাজারে সেটেলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে মাটিরাঙ্গা বাজারে গাড়ী থামিয়ে নিরীহ জুম্ম যাত্রী ও পথচারী জুম্মদের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। এ সময়ে সেটেলার বাঙালিরা রাস্তা অবরোধ করে গাড়ি ভাঙচুর ও জোরপূর্বক সকল দোকানপাট বন্ধ করে দেয়।

সেটেলার বাঙালিদের হামলায় আহতদের মধ্যে মাটিরাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তিকৃত আহতরা হলেন- উসেমং মারমা (১৮), পিতাঃ অগ্য মারমা, গ্রামঃ মংহ্লাপাড়া, লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা (খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, ১ম বর্ষ) এবং ২. মংসাউ মারমা (২৫), চাঁদের গাড়ি ড্রাইভার, পিতাঃ মংসাজাই মারমা, গ্রামঃ মংহ্লাপাড়া, লক্ষ্মীছড়ি।

লংগদুতে ভূমি বেদখল ঠেকাতে গিয়ে ৪ জুম্ম নারী সেটেলার বাঙালির মারধরের শিকার

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের যাত্রামুড়া গ্রামে ৪ জুম্ম নারী নিজেদের চাষের জমিতে ধান লাগাতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী সেটেলার বাঙালিদের বেদম মারধরের শিকার হয়েছে। এতে একজনকে লংগদু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বস্তুত জুম্মদের জমি বেদখল করার উদ্দেশ্যেই সেটেলার বাঙালিরা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

জানা গেছে, ঐদিন বিকাল আনুমানিক ৪:০০ টায় লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের যাত্রামুড়া গ্রামের ৪ জুম্ম নারী বাড়ির অনতিদূরে নিজেদের চাষের জমিতে যখন ধান লাগাতে ব্যস্ত ঠিক তখনি পার্শ্ববর্তী সেটেলার গ্রামের এক সেটেলার নারী (শহীদুল্লা'র স্ত্রী হিসেবে পরিচিত) সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং জুম্ম নারীদের ধান লাগাতে নিষেধ করতে থাকে। বংশ পরম্পরায় চাষ করে আসা নিজেদের জমিতে হঠাৎ এই সেটেলার নারীটির বারণ শুনে প্রথমে তারা শুনেও না শোনার মত করে কাজ করার চেষ্টা করে। এরপরও যখন সেটেলার নারীটি নানা গালাগাল শুনিয়ে বারণ করতে থাকে তখন জুম্ম নারীরা তারা যে এ জমির মালিক তা বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও উদ্ধতভাবে একই আচরণ করতে থাকলে জুম্ম নারীরা সেটেলার বাঙালি নারীকে ধাক্কা দিয়ে ঐ জায়গা থেকে সরতে বাধ্য করে। এরপরই সেটেলার নারীটি দৌড়ে ফিরে গিয়ে তার স্বামীসহ ৪ সেটেলার বাঙালিকে ডেকে নিয়ে আসে। এতে সেটেলার বাঙালিরা কোন বাছবিচার না করে ৪ জুম্ম নারীকে কাদায় ও মাটিতে ফেলে বেদম প্রহার করে। মারধরের শিকার ৪ জুম্ম নারী হল– (১) চিজিবি চাকমা (৩৩), স্বামী-জ্যোতি বিকাশ চাকমা, (২) ধমবি চাকমা (৫০), স্বামী-আনন্দ কুমার চাকমা, (৩) ভারতী বালা চাকমা (৩০) পীং-আনন্দ কুমার চাকমা ও (৪) ধনবি চাকমা (৩০) স্বামী-অমল চাকমা। এদের মধ্যে চিজিবি চাকমাকে লংগদু হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অপরদিকে জুম্ম নারীদের উপর হামলাকারী ৪ সেটেলার বাঙালি হল– (১) শহিদুল্লা (৪৫), পীং-আশরাফ আলী, সাং-যাত্রামুড়া সেটেলার পাড়া, (২) কাউসার (৩০), পীং-অজ্ঞাত (শহিদুল্লা'র মেয়ের জামাই), সাং-ঐ, (৩) মিরাজ (২৭), পীং-রুস্তম, সাং-ঐ ও (৪) জলিল (১৮), পীং-শহিদুল্লা, সাং-ঐ।

বান্দরবানে নির্বিচারে পাথর উত্তোলনের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব

বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার টংকাবতি, রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং, লামা উপজেলার লাইনঝিরি, কাঁকড়াঝিরি, হরিণঝিরি, টাকের পানছড়ি মৌজা, শীলের তোয়া, কাঁঠালছড়া, নন্দির বিল ও ফাঁসিয়াখালী এবং রুমা, থানচি, আলীকদম প্রভৃতি এলাকার ঝিরি ও পাহাড় খুঁড়ে, বারুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অবাধে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। পাহাড় ও ঝিরি অঞ্চল খুঁড়ে নির্বিচারে পাথর উত্তোলনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অবাধে পাথর উত্তোলন করার ফলে পাহাড়ি ঝিরিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। পাথর উত্তোলনের ফলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীদেরও বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কয়েক বছর ধরে প্রভাবশালী লোকজন এভাবে বিভিন্ন ঝিরি থেকে ভাসমান পাথর সংগ্রহের কথা বলে প্রশাসনকে ম্যানেজ করে পাথর উত্তোলন করছে। জানা যায় যে, আলীকদম-থানচি সড়ক নির্মাণ কাজে মাংগু, তৈনফা মৌজা ও পামিয়া পাড়ার আশে-পাশের ঝিরি থেকেও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের ফলে এলাকাগুলোর পানির উৎস নষ্ট হয়ে গেছে। পাথর উত্তোলনের ফলে পাহাড়ের ঝিরি শুকিয়ে যাওয়ায় পানির সংকট দেখা দেওয়ায় ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ জেলা সদরের টংকাবতী ইউনিয়নের তিনটি মৌজায় পাথর উত্তোলন বন্ধের দাবিতে স্থানীয় লোকেরা বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে। জানা যায় যে, অবৈধভাবে পাথর আহরণ বন্ধ করা না হলে পাহাড়ি ঝিরি ও ছড়ার পানি শুকিয়ে জুম্ম গ্রামবাসীর জন্য পানি সংকট তীব্র হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। অনুমোদন ছাড়া পাথর আহরণ নিষিদ্ধ হলেও প্রভাবশালী একশ্রেণির ব্যবসায়ী ঝিরি থেকে পাথর উত্তোলনের জন্য জেলা প্রশাসনের যোগসাজসে এলাকার সবকয়টি ঝিরি ও পাহাড় খুঁড়ে পাথর উত্তোলন করছেন।

বান্দরবানে ইজারাদারের হুমকিতে ৮০ পরিবার উচ্ছেদের আশংকা

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন সরই ইউনিয়নাধীন ডলুছড়ি মৌজার নতুন পাড়া, ঢেকিঁছড়া পাড়া ও নোয়া পাড়া ৮০টি পরিবার তাদের দীর্ঘ বৎসরের ভোগদখলীয় জুম ভূমিতে প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় জুম কাটতে গেলে লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর ম্যানাজার মোঃ আরিফ-এর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন ভাড়াটে সন্ত্রাসী জুম চাষে বাধাদান করে। জুম কাটা বন্ধ করা না হলে জুম্মদেরকে হত্যা ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলেও তারা হুমকি প্রদান করে।

৬৪টি প্লট-এর অনুকূলে মোট ১৬০০ একর লীজ নেয়া হয়েছে বলে লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ দাবি করছে। এসব এলাকায় কোনভাবেই জুম চাষ করা যাবে না বলে লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ গ্রামবাসীদেরকে হুমকি দিচ্ছে। কথিত ম্যানেজার ও সন্ত্রাসীরা শাসাচ্ছেন যে, পরবর্তীতে জুম কাটাবস্থায় পেলে সবাইকে মারধর করা হবে এবং থানার পুলিশ নিয়ে এসে ধরে নিয়ে যাবে। পরবর্তীতে এলাকার জুম চাষীরা কাগজপত্র সংগ্রহ করে দেখা যায় যে, বিগত ১৯৮০ সনের দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম সহ বাহিরাগতদের নামে লীজ নেয়া হয়েছিল, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে লীজগুলি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। এই ব্যাপারে জুম চাষী কাইংপ্রে ম্রো, সুমন ত্রিপুরা ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর বিরুদ্ধে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ প্রশাসনের নিকট আবেদন নিবেদন করেও কোন ধরনের সুরাহা বা প্রতিকার পায়নি। ৮০টি জুমচাষী পরিবার আশংকা প্রকাশ করছেন যে, লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ৬৪টি প্লট বাতিল করা না হলে শুধু ৮০টি পরিবার নয়, আরো শতাধিক পরিবার উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবে। কারণ এলাকার সকলের অবলম্বন হচ্ছে একমাত্র জুম চাষ। এলাকার জুম চাষীরা লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নামে বিভিন্ন জনের নামে ৬৪টি প্লট বাতিলসহ আশু প্রতিকারের দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, রাবার চাষের নামে বহিরাগতদের কাছে হাজার হাজার একর ভূমি লীজ দেয়ার ফলে এবং গ্যারিসন সম্প্রসারণ ও আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে চুক্তির পর কমপক্ষে ৩০টি গ্রাম থেকে জুম্মরা উচ্ছেদ হয়েছে। এসব গ্রামগুলো–

ক. বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের অধীন

ক্রঃ	গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	যে সালে উচ্ছেদকৃত	যে কারণে উচ্ছেদ
১.	সাপ্রু পাড়া	২৭	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২.	মংহ্লাপ্রু পাড়া	৩৭	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৩.	হমপ্রুম পাড়া	১৩	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৪.	সিংচ্যং পাড়া	১১	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৫.	পোড়া পাড়া	৩১	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৬.	কচ্ছপতলি পাড়া	১৫	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৭.	নতুন ছাতং পাড়া	২৬	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৮.	দেওয়াই হেডম্যান পাড়া	২৯	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৯.	দেবা পাড়া	১৮	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১০.	গয়ালমারা পাড়া	৩৭	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১১.	মেম্বার পাড়া	১৭	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১২.	ভাগ্যকূল পাড়া	৩১	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৩.	হিন্দু পাড়া	০৭	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৪.	খদুখলা পাড়া	২০	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৫.	মেরালি কূলা পাড়া	১৫	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৬.	মেরালি চাকমা পাড়া	০৮	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৭.	হাতিদেরা পাড়া	১০	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৮.	আন্তর পাড়া	২২	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৯.	রামরি পাড়া	৪২	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২০.	সাকয় পাড়া	১৯	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২১.	লতাঝিরি পাড়া	১১	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২২.	লতাবন্য পাড়া	০৬	২০০০	আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

খ. লামা উপজেলার ফাস্যাখালী ইউনিয়নের অধীন

ক্রঃ	গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	যে সালে উচ্ছেদকৃত	যে কারণে উচ্ছেদ
১.	বাচিং মারমা পাড়া	১৭	২০১৫	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান
২.	আমতলী ম্রো পাড়া	২২	২০১৫	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান
৩.	চারিখ্য ত্রিপুরা পাড়া	১২	২০১৫	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান

গ. নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের অধীন

ক্রঃ	গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	যে সালে উচ্ছেদকৃত	যে কারণে উচ্ছেদ
১.	রাঙাঝিরি চাকমা পাড়া	১৭	২০১১	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান
২.	গোয়ালমারা মারমা পাড়া	২০	২০১৫	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান
৩.	লংগড়ু চাক পাড়া	১৫	২০০০	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান
৪.	বাদুঝিরি চাক পাড়া	২২	২০১৫	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান
৫.	হামরাঝিরি মারমা পাড়া	১৭	২০১৫	ভূমি লীজ ও রাবার বাগান

কাপ্তাই বাজারে বহিরাগত বাঙালি জেলেদের কর্তৃক জুম্মদেরকে হামলার চেষ্টা, গালিগালাজ

প্রতিবাদে জুম্মদের লাগাতার কাপ্তাই বাজার বর্জন

কাপ্তাই বাজারে বহিরাগত বাঙালি জেলেদের কর্তৃক জুম্ম ক্রেতা-বিক্রেতাদেরকে হামলার চেষ্টা, গালিগালাজ ও বাজার থেকে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে প্রায় চার সপ্তাহ ধরে জুম্মদের কর্তৃক কাপ্তাই বাজার বর্জন কর্মসূচি চলছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হলেও কোন চূড়ান্ত সমাধান ছাড়াই আলোচনা শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ডেপুটি কমিশনার উভয় পক্ষকে স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ রোজ শনিবার রাঙ্গামাটি জেলার অন্যতম পুরাতন বাজার কাপ্তাই বাজারের বাজার দিন ছিল। অন্যান্য দিনের মতই ঐদিনও কাপ্তাই উপজেলার বিভিন্ন এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ও বিলাইছড়ি উপজেলার জুম্ম গ্রামবাসীরাও কেনাবেচার উদ্দেশ্যে কাপ্তাই বাজারে আসে। বেলা প্রায় ১১:৩০টা-১২:০০টার দিকে ঢাকাইয়া জেলে হিসেবে পরিচিত সুজন নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল বহিরাগত বাঙালি বাজারে প্রবেশ করে জুম্মদের গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ৪/৫ জন জুম্মকে গালিগালাজ ও ধাক্কা দিতে দিতে বাজার ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কয়েকজনকে জোর করে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাজার ছেড়ে যেতে বলে।

ঘটনাটি দেখে অন্যান্য কয়েকজন জুম্ম পরিচিত কিছু বাঙালির শরণাপন্ন হয়ে ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করে এবং উদ্ভূত সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে। এতে কয়েকজন বাঙালি মুরুব্বী মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলে ঐ বহিরাগত বাঙালি জেলেরা সেই বাঙালি মুরুব্বীদেরকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরে জুম্মরা কাপ্তাই বাজার ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'কাপ্তাই বনিক কল্যাণ সমিতি'র মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা ও সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে। কিন্তু কল্যাণ সমিতির মুরুব্বীরা জুম্মদের এই উদ্যোগে সাড়া দেয়নি।

জানা যায় যে, বহিরাগত ঢাকাইয়া জেলেরা আগের দিন শুক্রবার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান এলাকায় মাছ ধরতে গেলে জুম্মরা তাদের মাছ ধরার ফাঁদ (স্থানীয় ভাষায় 'চেই') ভেঙে দিয়েছে এবং তাদেরকে জাল টানতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ এনে সেদিন কাপ্তাই বাজারে ঢাকাইয়া জেলেরা জুম্মদের উপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে বাজারে বহিরাগত বাঙালি জেলেদের উদ্ধত কথাবার্তা ও বেপরোয়া ঘোরাফেরা দেখে প্রত্যক্ষদর্শী জুম্মরা তাদের উপর হামলা হতে পারে আশঙ্কা করলে তারা পরস্পর জানাজানি করে দ্রুত বাজার ত্যাগ করে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জুম্মদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ঐ বহিরাগত জেলেরা প্রায়ই মাছ ধরতে ধরতে জুম্মদের ঘাটে ও বসতিতে চলে আসে এবং এক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। এই জেলেরা ঐ এলাকায় মাছ ধরতে আসার পর এ পর্যন্ত জুম্মদের অনেকেই কেউ নৌকা, বৈঠা, কখনো ছাগল, পানি তোলার মটর চালিত যন্ত্র ইত্যাদি হারিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে জুম্মরা যারা নিজেদের বসতভিটার ঘাটে মাছ আকৃষ্ট করার জন্য জাক (কচুরিপানা দিয়ে তৈরী এক প্রকার মাছের অভয়াশ্রম) এর ব্যবস্থা করত সেখানে এসেও জেলেরা মাছ ধরত। এনিয়ে ঢাকাইয়া জেলেদের সাথে জুম্মদের প্রায় বাক-বিতন্ডা হয়। এব্যাপারে একাধিকবার প্রতিবাদ ও স্থানীয় সেনাক্যাম্প কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এই জেলেরা শুধু জাল ও বরশি দিয়ে মাছ ধরে না, আরও নানা কায়দায় তারা এমনভাবে মাছ ধরে তাতে নির্বিচারে মাছ ধরা পড়ে। যার ফলে এলাকায় মাছের বংশ বৃদ্ধি বা প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও হুমকি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এলাকাবাসীর মতে, কাপ্তাই বাজার একটি পুরনো বাজার হলেও বর্তমানে এটি প্রায় বহিরাগত অস্থায়ী বাঙালিদের দখলে। বস্তুত কাপ্তাইয়ের পুরনো বা স্থায়ী ব্যবসায়ীদের সাথে জুম্মদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে বহিরাগত বাঙালি জেলেদের সাথে। জানা গেছে, তাই বাজার বর্জনকারী জুম্মদের মূল দাবি হচ্ছে, কাপ্তাই এলাকায় বহিরাগত ঐসব জেলেদের মাছ ধরা বন্ধ করা।

ফটিকছড়ির কাঞ্চনপুর চা-বাগান এলাকায় বাঙালিদের কর্তৃক পাহাড়িদের বসতবাড়িতে হামলা

গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ বিকাল আনুমানিক ২:১৫টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা কাঞ্চনপুরের "টেকবাড়িয়া ও কর্ণফুলী" চা-বাগানের সরকারী ঢেবাস্থ "চিংছড়ি" নামক স্থানে বসবাসরত পাহাড়ি গ্রামবাসীদের বাড়িঘরের উপর চা-বাগানের মালিকের প্ররোচণায় বাগানের শ্রমিকসহ পূর্ব কাঞ্চনপুরের শতাধিক বাঙালি হামলা চালায়। এ হামলায় বাগানের ম্যানেজার ইলিয়াস আহম্মেদ নেতৃত্ব দেয় বলে জানা যায়। হামলাকারীরা পাহাড়িদের ৮টি বাড়ি আগুনে পুড়ে দেয় এবং ৮টি বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট চালায় বলে জানা যায়।

যাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় তারা হলেন–

১. অমর জ্যোতি চাকমা (২৩) পিতা-অমজ্যা চাকমা, গ্রাম-সুমন্তপাড়া, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ২. জ্ঞান চাকমা (২৭) পিতা-লক্ষ্মী কুমার চাকমা, গ্রাম-বান্যাছোলা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ৩. সুরেশ চাকমা (৩০) পিতা-শুক্র কুমার চাকমা, গ্রাম- বান্যাছোলা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ৪. দেব কুমার চাকমা (৫৫) পিতা- মৃত ছাগন্যা চাকমা, গ্রাম- মিদিঙ্যাছড়ি, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ৫. শিলন্দ চাকমা (৪৫) পতা-লাম্বাশিরা চাকমা, গ্রাম- বান্যাছোলা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ৬. বাবুল সাওতাল (৪৫) পিতা- নিরঞ্জয় সাওতাল, গ্রাম-বান্যাছোলা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৫ জন, ৭. সুনীতি চাকমা (৩০) পিতা- কিনা মোহন চাকমা, গ্রাম- বান্যাছোলা। ৮. অমিত কুমার চাকমা (৩০) পিতা- সোনা মোহন চাকমা, গ্রাম-বান্যাছোলা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন।

যাদের বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করা হয় তারা হলেন-

১. বুদ্ধমনি চাকমা (৬৫) পিতা-কর্ণজয় চাকমা, গ্রাম-গবমারা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ২. মরতছবুয়া চাকমা (৩৫) পিতা-ধামাজ্যা চাকমা, গ্রাম-গবমারা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ৩. সন্ত চাকমা (৩০) পিতা- নীল কুমার চাকমা, গ্রাম-বান্যাছোলা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন, ৪. বসন্ত চাকমা (৩২) পিতা-মনিন্দ্র চাকমা, গ্রাম-সুমন্তপাড়া, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৭ জন, ৫. সুজেন্দ্র চাকমা (৩৫) পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম-সুমন্তপাড়া, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৫ জন, ৬. লিন্দু চাকমা (৩৫) পিতা- অজ্ঞাত, সাং-দীঘিনালা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা-৩ জন, ৭. কেংগেরা চাকমা (৩০) পিতা- জন্মধন চাকমা, গ্রাম-খামারপাড়া, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৩ জন, ৮. জুনাক চাকমা (৪৫) পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম- যতীন্দ্র কার্বারীপাড়া, পরিবারের সদস্য সংখ্যা- ৪ জন।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন এলাকা থেকে বিগত ২০১২-১৩ সালে প্রায় ১৫/১৬ পাহাড়ি পরিবার উক্ত এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। বসতি গড়ার পর থেকে ঐ এলাকাটি কর্ণফুলী চা-বাগানের মালিক তার চা-বাগান এলাকা বলে দাবি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ চা-বাগানের মালিকপক্ষ "চিংছড়ি" পাহাড়ি গ্রামবাসীদের বাড়িঘরের উপর হামলা চালিয়ে উক্ত গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এম. এন. লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

বরকলে বিজিবি কর্তৃক বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত, প্রতিবাদে মিছিল ও বিক্ষোভ

গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ বরকল উপজেলা সদরের ২২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের (বিজিবি) নদীর ঘাটে ৮ জন ভিক্ষু ও শ্রমণকে তল্লাসীর নামে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। এ ঘটনায় কয়েক শতাধিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নারী পুরুষ বিজিবি জোনের সামনে সমাবেশের পর মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মিছিলটি বিজিবি জোন ঘাট থেকে হাসপাতাল এলাকা হয়ে বাজার প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদের মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

জানা যায়, গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ বরকল উপজেলার সীমান্তবর্তী ভূষণছড়া ইউনিয়নের মরা ঠেগা দোর এলাকায় বুদ্ধ আলো ধর্মশালায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও একই ইউনিয়নের বড় উজ্জ্যাংছড়ি শাখা বন বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ বিকালে রাঙামাটির কাটাছড়ি স্বর্গপুর বন ভাবনা কেন্দ্রে ফেরার সময় ২২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের সদস্যরা (বিজিবি) তল্লাসীর নামে নদীর ঘাটে স্পীড বোট থেকে নামিয়ে ভিক্ষু ও শ্রমণদের প্রায় দু ঘন্টা আটকিয়ে রেখে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে। এ সময় তাদের সাথে থাকা বুদ্ধমূর্তিগুলোর ভিতরে কোন স্বর্ণ কিংবা অবৈধ কিছু আছে কিনা তা পরীক্ষার নামে বিজিবি জওয়ান ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন বুদ্ধমূর্তিগুলোকে মাটিতে আঘাত করে। পরে বরকল বাজারের স্বর্ণ দোকানদার লিটন শীলের কাছে নিয়ে বুদ্ধমূর্তিগুলোতে স্বর্ণ আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর কোন স্বর্ণ নেই বলে জানালে বুদ্ধমূর্তিগুলোকে মাটিতে ফেলে রাখে বলে জানা যায়। এ সময়ে ভিক্ষুদের খাবার পাত্র (সাবেক্ষ) সহ অন্যান্য দানীয় মালামালগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এরপর ছোট হরিণা ২৫ বিজিবির জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌস ও বরকল সদর ২২ বিজিবি জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আলাউদ্দিন আল মামুন ধর্মতিষ্য মহাস্থবির ভিক্ষুকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন করে। ভিক্ষু ও শ্রমণদের আটকের খবর জানাজানি হলে কয়েক শতাধিক জনগণ বিজিবি জোনের সামনে জড়ো হয়ে শ্লোগান দিতে থাকে। এসময় উত্তেজিত এলাকাবাসীদের সাথে বিজিবি সদস্যদের তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়। ঘটনার সময় বিজিবি রাঙামাটি সেক্টর কমান্ডার ও ছোটহরিণা জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌস ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ির থলিপাড়া গ্রামে সেনাবাহিনীর হামলা, আটক দুই

গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ ভোর রাত ১:০০ টায় বিজিতলা আর্মী ক্যাম্প থেকে ১৫/২০ জনের একদল সেনা (এক জীপ) খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের নুনছড়ি মৌজাস্থ থলিপাড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা কালি বন্ধু ত্রিপুরার বাড়ি ঘেরাও করে। বাড়ির লোকদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে সবাইকে উঠানে নিয়ে জড়ো করে। এ সময়ে সেনা সদস্যরা একটা হ্যান্ড ব্যাগ (বাজার ব্যাগ) নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে। ঘর থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে দু'টি পাইপ গান পাওয়া গেছে বলে জানায়। পরে সেনা সদস্যরা সেখানে প্রায় তিন ঘন্টা থাকার পর রাত তিনটায় অস্ত্রগুলো গুজিয়ে দিয়ে তিনজনের ছবি তুলে এবং ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। আটককৃতরা হল- ১) কালি বন্ধু ত্রিপুরা (৫২) পিতা: তাইয়া রাম ত্রিপুরা; ২) যত্ন ত্রিপুরা (৩২) পিতা: কালি বন্ধু ত্রিপুরা; ৩) রতন ত্রিপুরা (২৮) পিতা: কালি বন্ধু ত্রিপুরা। রতন ত্রিপুরাকে সেদিন ছেড়ে দেয়া হলেও বাকী দুইজনকে খাগড়াছড়ি থানায় সোপর্দ করে।

রুমায় জনসংহতি সমিতির কর্মীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদে সমিতি ও পিসিপি'র উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাত আনুমানিক প্রায় ৩:০০টা সময় বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলায় জনসংহতি সমিতি রুমা থানা শাখার সদস্য ও ৮নং ওয়ার্ডের মেম্বার শৈহাপ্রু মারমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তার বাড়িতে বেড়ার ফাঁকে দেশীয় তৈরি গাদা বন্দুক দিয়ে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বালিশের নিচ দিয়ে তার ডান হাতে আচড় লেগে চলে যায়। ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অজ্ঞাতনামা নামে মামলা করা হয়েছে। মামলা নং ১-(১-৩-২০১৬ইং ধারা-৩২৪/৩০৭)।

এদিকে গত ১ মার্চ ২০১৬ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় এই হামলার প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) রুমা থানা শাখার উদ্যোগে রুমা বাজার প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এর আয়োজন করা হয়েছে। সমিতির রুমা থানা শাখার সভাপতি লুপ্রু মারমা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা কমিটি সদস্য মংশৈপ্রু খিয়াং, রুমা থানা শাখা সাধারণ সম্পাদক মং মং সিং মারমা ও পিসিপির রুমা থানা শাখার সভাপতি মংমিন মারমা প্রমূখ। বক্তারা অবিলম্বে দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি প্রদানের জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।

সাজেকে মাইক্রোবাসে আগুন, সেনাবাহিনীর হুমকিতে ৩ জুম্ম পরিবার উদ্বাস্তু

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ বাঘাইছড়ি জেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে পর্যটকবাহী একটি মাইক্রোবাস কে বা কারা পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনার জের ধরে স্থানীয় বাঘাইহাট সেনা জোনের সেনাসদস্যরা কোন প্রকার তদন্ত বা বাছবিচার ব্যতিরেকেই সাজেকের মাচলং-রুইলুই সড়ক সংলগ্ন ৩ জুম্ম পরিবারকে গুলি করার হুমকি প্রদান করলে আতঙ্কিত ঐ ৩ জুম্ম পরিবার বর্তমানে বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জানা গেছে, বর্তমানে তারা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বাস্তুচ্যুত পরিবারসমূহ হল–

(১) শান্ত চাকমা, পীং-সাম্মো চাকমা, (২) লক্ষ্মীকান্ত চাকমা, পীং-ঐ ও (৩) কালাবরণ চাকমা, পীং-ঐ।

উল্লেখ্য, জানা গেছে, ঐ দিন সকাল বেলা পর্যটনে আসা ঐ মাইক্রোবাসটি সাজেক থেকে খাগড়াছড়ির দিকে ফিরছিল। সকাল প্রায় ৯:০০টার দিকে মাইক্রোবাসটি মাচলং-এর সীমানায় ৮নং এলাকায় পৌঁছলে কে বা কারা এটির গতিরোধ করে। এসময় তারা বাসের ভেতরে থাকা পর্যটক ও তাদের জিনিসপত্র বের করে দিয়ে মাইক্রোবাসটিতে পেট্রল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এসে পর্যটকদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। এর পরপরই সেনাসদস্যরা কোন প্রকার তদন্ত বা যাচাইবাছাই ব্যতিরেকে ঘটনাস্থল সংলগ্ন ঐ জুম্ম পরিবারের নাম উল্লেখ করে গুলি করে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিতে শুরু করলে উক্ত জুম্ম পরিবারসমূহ প্রাণের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

জুম্মদের উচ্ছেদ করে বরকলে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে অরক্ষিত সীমান্ত রক্ষার নাম দিয়ে নতুন করে বরকল উপজেলার বড়হরিণা, ভূষণছড়া ও আইমাছড়া ইউনিয়নে ১০টি নতুন বিজিবি ক্যাম্প সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে আর কয়েকটি নির্মাণের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্যাম্পগুলোর নাম হচ্ছে- বড়হরিণা ইউনিয়নের ১বিজিবি রাজনগর জোন লংগদু কর্তৃক গোলাছড়ি পাড়া নামক স্থানে অনিল কান্তি চাকমা ও প্রেমময় চাকমার ৩.০০ একর জায়গার উপর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। শুকনাছড়ির গ্রামের অংগচন্দ্র চাকমার (বৈদ্য) ২.০০ একর জায়গার উপর তালছড়া নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ছোটহরিণা ২৫ বিজিবি জোন কর্তৃক শ্রীনগর গ্রামের চিত্র কুমার চাকমার ২.০০ একর জায়গার উপর ক্যাম্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একই কায়দায় ছোটহরিণা ২৫ বিজিবি জোন কর্তৃক গাছহাবাছড়া নামক স্থানে ক্যাম্প করা হয়েছে। কুকিছড়া বাজারের পাশে কান্যারাম চাকমার ৫.০০ একর জায়গার উপর ক্যাম্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। ছোটহরিণা ২৫ বিজিবি জোন কর্তৃক ভূষণছড়া ইউনিয়নের মৃত পংচান চাকমার ৪.০০ একর জায়গার উপর ভালুক্যাছড়ি নামক স্থানে ক্যাম্প নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিজিবি জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইমাছড়া ইউনিয়নের ভূওঠেগ নামক গ্রামের ধনঞ্জয় চাকমার ৫.০০ একর জায়গা জোর করে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে ও একই গ্রামের দয়া মোহন চাকমার ৩.০০ একর জায়গা ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে জোর পূর্বক দখল করে তাদের অন্যত্র তাড়িয়ে দিয়ে ক্যাম্প নির্মাণের চেষ্টা চলছে। তলঅ করল্যাছড়ি গ্রামের প্রভাত চন্দ্র চাকমার ২.০০ একর জায়গার উপর ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। একই ইউনিয়নের উলুছড়ি গ্রামের সাধনা চাকমা, জ্ঞান রঞ্জন চাকমা ও জ্ঞান চন্দ্র চাকমা- এই তিনজনের প্রায় ৪.০ একর জায়গা জোরপূর্বক দখল করে ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা চলছে বলে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮তম বর্ষপূর্তির গণসমাবেশ অনুষ্ঠানের আরও ছবি

সংগঠন সংবাদ

চট্টগ্রামে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন

সুমন চাকমা সভাপতি, অনিল চাকমা সাধারণ সম্পাদক, দিশান তঞ্চঙ্গ্যা সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রামের রেশমি কমিউনিটি সেন্টারে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ৮ম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হোন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করুন– এ আহ্বানের মধ্য দিয়ে সুমন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা।

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাংগঠনিক দিশান তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ সম্পাদক সুকান দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি উমিশ দেওয়ান, ব্যারিষ্টার কলেজ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ইব্রাহিম খলিল বাদশা, ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী প্রমুখ।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা বলেন, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, বাংলার আপামর মানুষ কি তা অর্জন করতে পেরেছে বা তা কি ভোগ করতে পেরেছে? নিশ্চয়ই নয়। বাংলাদেশের মানুষ আজ ধর্মীয় মৌলবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাই আজকে আমাদের এই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সেটা যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে আজকে বাংলাদেশে যে অবস্থা চলছে, যে অরাজকতা চলছে, বাংলাদেশে যে জাতিগত নিপীড়ন, ভাষাগত নিপীড়ন, ধর্মীয় নিপীড়ন চলছে তা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। আমি আজ মহাজোট সরকারের কাছে আহ্বান জানাবো- বাংলাদেশকে সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করুন। বাংলাদেশের সকল মানুষ

নাগরিক হিসেবে বাঙালি এই শব্দ সংবিধান থেকে তুলে দিন। বাংলাদেশ শুধু মুসলিম ধর্মগোষ্ঠীদের রাষ্ট্র নয়। এটা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র।

প্রণতি বিকাশ চাকমা আরো বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে গড়িমসি করে চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে জুম্ম জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে। কেন এই অসহযোগ আন্দোলন তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ভাবতে হবে পাহাড়ের কথা। কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে? আবার কেন চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না? এই মৌলিক বিষয়টা যদি আমরা সবাই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা গৎবাঁধা শ্লোগানের মধ্যে ঘুর্ণায়মান থাকবো। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোন জাতিকে রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে কিছু সময় দাবিয়ে রাখা যায়। কিন্তু চিরকাল দাবিয়ে রাখা যায় না। সেটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই বলুন, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীই বলুন, কেউ জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। যে দেশে এমন ইতিহাস ঘটেছে সে দেশের সরকার কেন সে সত্যটা উপলব্ধি করছে না। আজও কেন উগ্র ধর্মান্ধতা, উগ্র জাতীয়তাবাদের জোরে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। ইতিহাসের পুরাবৃত্তি ঘটবে, যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া না হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আজ যে কোন সময়ের তুলনায় অত্যন্ত নাজুক। সেই নাজুক পরিস্থিতিকে নিজের বাসোপযোগী করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অসহযোগ আন্দোলনের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। তাই আমাদের যা শক্তি আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ বলেন, তিন পার্বত্য জেলা ও বিভিন্ন অঞ্চলের যে আদিবাসীরা আছেন তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে তারা যেভাবে পাকিস্তানীদের বৈষম্যের শিকার হয়েছিল ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও তাদের মৌলিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, ভূমির অধিকার তারা ফিরে পায়নি। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও দেশের প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলেন, ভাষাগত সংখ্যালঘু বলেন এবং সামষ্টিক জনগোষ্ঠী সবাইকে লড়াই সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর আমরা ভেবেছিলাম যে, এদেশে কোন বৈষম্য থাকবে না। এদেশে ধনী গরীবের ব্যবধান কম থাকবে। সবাই সমান শিক্ষার সুযোগ পাবে, সবাই সমান স্বাস্থ্য সেবা পাবে। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরে বাংলাদেশ যে

অর্থনৈতিক অবস্থা, যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যে শিক্ষাব্যবস্থা, সবকিছু যদি বিবেচনা করি তাহলে দেশের ১৬ কোটি জনগণ কেউ ভালো নেই। যারা ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তারাই আজ সেই চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে চলেছে। সেই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সবাইকে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে। সংগঠিত জনতাই পারে এদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায় করতে। আপনাদের ভূমি অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে চলমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়াতে হবে।

জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম দলিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজকে ১৮ বছর ধরে সরকার বাস্তবায়নের নামে তালবাহানা করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পার্বত্যাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় তাদের শ্রম বিক্রি করে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে এই হাজার হাজার শ্রমিক তারা তাদের অধিকার নিয়ে তাদের জন্মভূমিতে বসবাস করতে পারতো।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন করে, নির্যাতন করে তাদেরকে বঞ্চিত করে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে পৌছে যাবে সেটা আমরা বিশ্বাস করি না। তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করি ১৯৯৭ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, বিশ্বের মেহনতির বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও শেখ হাসিনার মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সে চুক্তি যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বাংলাদেশে শান্তির ফোয়ারা বইবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে পৌছে যাবে। পাহাড়িদের বঞ্চিত রেখে, তাদেরকে ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, বাংলাদেশ কখনো উন্নত দেশের কাতারে পৌছতে পারে না।

সমাবেশ শেষে সুমন চাকমাকে সভাপতি, অনিল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, দিশান তনচঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কমিটি গঠন করা হয়। পরে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

রাঙ্গামাটির বিভিন্ন উপজেলায় মহিলা সমিতির থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জুম্ম নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যাতে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলায় মহিলা সমিতির থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এসমস্ত থানা শাখা সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

জুরাছড়িঃ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ সকাল ১০:০০ টায় জুরাছড়ি উপজেলায় মহিলা সমিতির ৫ম বার্ষিক থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক আল্পনা চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উদয়জয় চাকমা, মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ঝর্ণা চাকমা, জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত চাকমা ও মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সদস্য ও বনযোগীছড়া ইউপি চেয়ারম্যান সন্তোষ বিকাশ চাকমা, জনসংহতি সমিতির শুকনাছড়ি গ্রাম কমিটির সহ-সভাপতি সুমন চাকমা, মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান পাড়া গ্রাম কমিটির সভাপতি প্রিয়লক্ষ্মী চাকমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জুরাছড়ির মহিলা সমিতির সদস্য শেফালী চাকমা ও মনিকা দেওয়ান এবং সভা সঞ্চালনা করেন প্রভাপতি চাকমা।

সভায় নেতৃবৃন্দ জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষে নারী সমাজের নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নারী-পুরুষ সবাইকে সমানতালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ আল্পনা চাকমাকে সভাপতি, শেফালী চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও উষারাণী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা সমিতির নতুন জুরাছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ঝর্ণা চাকমা।

বিলাইছড়িঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল ১০:০০টায় বিলাইছড়ি উপজেলা অডিটোরিয়ামে 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার ৪র্থ থানা শাখা সম্মেলন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার বিদায়ী সভাপতি শ্যামা চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির

সভাপতি জড়িতা চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি ও বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমা, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য কানন কুসুম চাকমা, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ঝর্ণা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির দপ্তর সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি আলোময় তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিলাইছড়ি থানা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নয়ন জ্যোতি চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অরুণা দেবী চাকমা। অধিবেশনে আলোচনার শুরুতে প্রয়াত নেতা এম এন লারমাসহ শহীদদের স্মরণে দুই মিনিট মৌনব্রত পালন করা হয়। সম্মেলনের অধিবেশনে মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার বিগত মেয়াদের কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির বিদায়ী কমিটির সদস্য উৎপলা চাকমা।

সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে পুরুষের পাশাপাশি সমানতালে নারী সমাজকেও এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অরুণাদেবী চাকমাকে সভাপতি, উৎপলা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মল্লিকা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা সমিতির নতুন বিলাইছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা ও নব কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ঝর্ণা চাকমা।

কাউখালীঃ গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল ১০:০০ টায় কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়ায় জনসংহতি সমিতির থানা কার্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ২য় কাউখালী থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির কাউখালী থানা শাখার বিদায়ী সভাপতি ইখা চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা, জনসংহতি সমিতির কাউখালী থানা শাখার সহ-সভাপতি সুজিত তালুকদার মিন্টু, যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী থানা শাখার সভাপতি কাজল চাকমা। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক দীপন চাকমা এবং সভা সঞ্চালনা করেন মহিলা সমিতির কাউখালী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক বর্ণা চাকমা। নেতৃবৃন্দ তাদের আলোচনায় কাউখালী গণহত্যার কথা স্মরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত না হওয়াকে দায়ী করে সরকারের নিকট অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান। অন্যথায় চলমান অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হতে কঠোর করা হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সম্মেলনে ইখা চাকমাকে সভাপতি, বর্ণা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও লিপি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে মহিলা সমিতির নতুন কাউখালী থানা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন এই কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা।

বাঘাইছড়িঃ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ১০:০০ টায় সিজক কলেজ মাঠে মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির ৪র্থ শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীমালা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য সুমতি রঞ্জন চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি উৎপলাক্ষ চাকমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিপ চাকমা, ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক জ্ঞান বিকাশ চাকমা, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুমিতা চাকমা, যুব সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বুদ্ধাঙ্কুর চাকমা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সারোয়াতলী ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার সুভাষ কুসুম চাকমা, সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সাংফুই পাংখোয়া, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক দীপায়ন দেওয়ান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সিজক কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক কাকলী চাকমা। সভা সঞ্চালনা করেন জোসি চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন শর্মিষ্ঠা চাকমা।

সম্মেলনে লক্ষীমালা চাকমাকে সভাপতি, জোসি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অঞ্জলি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে মহিলা সমিতির নতুন বাঘাইছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয় এবং নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক আল্পনা চাকমা।

মহিলা সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি থানা সম্মেলন সম্পন্ন

এছিংমে মারমা সভাপতি, প্রছানু মারমা সাধারণ সম্পাদক, অংম্রাচিং চাক সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ সকাল ১০.০০ টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা হেডম্যান এসোসিয়েশন গোলঘরে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখা সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। কিরণ তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় ও এছিংমে মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি সভানেত্রী ও বান্দরবান জেলা সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইচিংপ্রু মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাগ্যলতা তঞ্চঙ্গ্যা, থানছি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান চশৈথোয়াই মারমা, জনসংহতি সমিতি নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মংনু মারমা, জনসংহতি সমিতি বাইশারী শাখার সভাপতি নিউহ্লামং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দীপায়ন চাকমা। সম্মেলনে স্বাগতম বক্তব্য রাখেন স্বপ্না তঞ্চঙ্গ্যা।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ওয়াইচিংপ্রু মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে নারী সমাজকে আরো অধিকতর লড়াই সংগ্রামে সামিল হতে হবে। না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন- নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তিনি নারী অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া জন্য নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলন শেষে এছিংমে মারমাকে সভাপতি, প্রছানু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অংম্রাচিং চাককে সাংগঠনিক সংম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখা গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান অতিথি ওয়াইচিংপ্রু মারমা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম স্থগিতের দাবিতে তিন ছাত্র-যুব সংগঠনের সমাবেশ

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬

রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বিশেষ বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা বলেন, আমরা বারবার বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের মধ্য দিয়ে সরকারকে আহ্বান করে যাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করার। কিন্তু সরকার কোন প্রকার আমলে নিচ্ছে না, কর্ণপাত করছে না। তৎপরিবর্তে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়িদের বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে বিলীন করে দেওয়ার জন্য নতুন নতুন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। তার মধ্যে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপনের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। যদিও আমরা দেখি তিন পার্বত্য জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যে বেহাল দশা ও কলেজের করুণ অবস্থা, সেগুলোর বিষয়ে কোন ধরনের পদক্ষেপ না নিয়ে পার্বত্যবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রশক্তির জোরে সরকার এই দুটি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য কেন উঠে পড়ে লেগেছে যা সহজে অনুমেয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করেছে যা আরও একবার সুস্পষ্ট রূপ উন্মোচিত হয়েছে রাঙ্গামাটি পৌরসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দিয়ে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে যা পৌরবাসী প্রত্যাখান করেছে।

সমাবেশের সভাপতি ও পাহাড়ি ছাত্র পারিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ১৯৬৫ সালে স্থাপিত রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজ করুণ দশায় রয়েছে। কলেজ বিল্ডিং-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যে কোন সময় ধ্বসে পড়তে পারে। সরকার তার পুন:নির্মাণ না করে জুম্ম স্বার্থবিরোধী ও চুক্তি পরিপন্থী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে চলেছে। যার ফল কখনোই সুখকর হবে না। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সেই সাথে অনতিবিলম্বে

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবি জানান তিনি। অন্যথায় যে কোন পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে হুশিয়ারী জানিয়ে সমাবেশ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি সদর থানা কমিটির সভাপতি পহেল চাকমা প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নবীনবরণ ও প্রবীণবিদায় অনুষ্ঠান

"আত্মকেন্দ্রিকতার শৃঙ্খল ভাঙ্গো, উন্মোচন করো জ্ঞানের দুয়ার, মানবতার জয়গানে মুক্তি আনো, এসেছে গণ জোয়ার" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার অধীনস্ত টিটিসি আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রাঙ্গণে ২০১৬ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি পরিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে "নবীন বরন-প্রবীণ বিদায় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ জনাব মো: সানাহউদ্দিন শেখ মহোদয়সহ ইলেকট্রিকেল মেইনটেনেন্স ওয়ার্কস ট্রেডের মুখ্য প্রশিক্ষক শৈবাল কুমার বড়ুয়া, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক চাকমা, রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ টিটিসি আঞ্চলিক শাখার সভাপতি রিপেন চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন সুপিয়ান চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২০১৫ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৌরব অর্জন করায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছাত্র-সমাজ একটি "জাতির ভবিষ্যত কান্ডারী"। তাদের উপরই নির্ভর করে একটি জাতির ভবিষ্যত কেমন হবে। তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের তাদের মেধা-জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে জাতি ও মানবতার স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, ছাত্রদের মাঝে অনুসন্ধান, সৃজনশীলতা, উদ্যোক্তা এবং নৈতিক নেতৃত্বের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। ছাত্রদেরকে কঠিন বাস্তবতায় শক্ত মনোবল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কাজের ব্যর্থতায় এগিয়ে যাওয়ার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহস ও সৎ হতে হবে। সবসময় নিজের মধ্য পুষতে হবে একটি বিশ্বাস "আমি পারি" "আমরা পারি" এবং "আমার জাতিই পারে" এ ধরনের মনোভাব।

উক্ত সভায় বক্তারা আরো বলেন, একজন ছাত্রকে লেখাপড়ার পাশাপাশি জুম্ম জনগণের বর্তমান বাস্তবতা ও দুর্দশাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নয়। পাশাপাশি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করা একটি ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব। অর্জিত সেই শিক্ষাকে সমাজ ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করার জন্য ছাত্র-সমাজকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। জুম্ম সমাজের বর্তমান বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য আহ্বান করা হয়।

বান্দরবান সরকারি কলেজে নবীনবরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ বেলা ২:০০ ঘটিকার সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে পুরাতন রাজবাড়ী মাঠে বান্দরবান সরকারি কলেজ, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ ও বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণি ও ২০১৫-২০১৬ সেশনে অনার্স ও ডিগ্রীর সকল নবাগত ছাত্রছাত্রীদের নবীণবরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি মুইয়মং মারমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহসভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য কে এস মং মারমা, জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উছোমং মারমা, জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি

উপজেলা চেয়ারম্যান ক্যাবামং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভানেত্রী ও বান্দরবান সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইচিংপ্রু মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চন্দ্রা ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সহসাধারণ সম্পাদক পরিমল চাকমা এবং মানপত্র পাঠ করেন বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বামং সিং মারমা।

প্রধান অতিথি উষাতন তালুকদার এমপি বলেন, সন্দেহ-অবিশ্বাস মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে পার্বত্যবাসীকে দূরে ঠেলে দেওয়া হবে। তখন পার্বত্যবাসী বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প পথের চিন্তা করলেও কারো কিছু করার থাকবে না। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন দেশের জন্য হুমকি নয়। চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। দেশের জন্য এবং উন্নয়ন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাধান না হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের পাহারায় পর্যটন হবে না। সমস্যার সমাধান হলে শুধু পর্যটন নয়, দেশের অর্থনীতির জন্য অবদান রাখতে পারে, এ রকম আরও অনেক দ্বার খুলে যাবে ।

চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র-যুব সমাজকে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২ নং গেইট শাখার যৌথভাবে দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি পিপলস মারমা এবং প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার। প্রধান অতিথি উষাতন তালুকদার ও সভাপতি পিপলস্ মারমা যথাক্রমে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং বেলুন উড়িয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস হোড়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মহিউদ্দিন মাহিম, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক চন্দ্রা ত্রিপুরা প্রমুখ। উদ্বোধনী অধিবেশন সঞ্চালনা করেন ধনবিকাশ চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত করছে পার্বত্য অঞ্চলের সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যক্তিরা।' তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে, চুক্তি নাকি প্রায় ৯৫% বাস্তবায়িত হয়েছে।' তিনি এহেন অপপ্রচার চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য সরকার ও বিভিন্ন দলের আমলাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষা ও পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র-যুব সমাজকে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং এই ছাত্র-যুব সমাজই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে অভিমত ব্যক্ত করেন ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পিপলস মারমা তার বক্তব্যে বলেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ একটি ত্যাগী ও গৌরবময় সংগঠন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সদা প্রস্তুত রয়েছে' বলে উল্লেখ করেন। তিনি সকল জুম্ম ছাত্র-জনতাকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পতাকা তলে সমবেত হয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি ধনবিকাশ চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট বিধায়ক চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি টোয়েন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা। এছাড়া বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি সক্রেটিস চাকমা প্রমুখ। এই অধিবেশনে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন বাবলু চাকমা।

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে পিপলস মারমাকে সভাপতি, মিলন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অনুপম চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি; রিটিশ চাকমাকে সভাপতি,

সত্যব্রত চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মনষী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি এবং যদুলাল চাকমাকে সভাপতি, ভূবন তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক ও হিমেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট থানা শাখা মর্যাদা কমিটি গঠিত হয়। পরিশেষে চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী ও গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার দাবিতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিসিপির সমাবেশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা মহানগর, রাজশাহী মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ইত্যাদি শাখার উদ্যোগে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটিসহ বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবিতে গত ১৭ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে নেতৃবৃন্দ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সরকার আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কথা থাকলেও সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া নাইজেরিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে নানান সমস্যার মাঝেও বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল সে দেশে ভাষা আন্দোলনের ৬৩ বছর পরেও আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতিকে রক্ষার আন্দোলন করতে হচ্ছে, যে আদর্শ ও চেতনায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল তা আজ হারিয়ে যাচ্ছে।

বক্তারা আরো বলেন, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির "খ" খন্ডের ৩৩(খ) অনুযায়ী রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ৩৬(ঠ) ধারায় আদিবাসীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে আইনগত

স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরিত 'আন্তর্জাতিক শিশু সনদ'-এর ৩০নং ধারায় বলা হয়েছে- "যেসব দেশে জাতিগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা, তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যদের সাথে ভাষা ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না"। এছাড়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও কনভেনশন নং ১০৭-এও মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। কিন্তু এ সকল আইন, নীতিমালা কেবলমাত্র কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রেখে আদিবাসীদের ভাষার সঠিক ব্যবহারসহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এছাড়াও বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দীর্ঘ ১৮ বছরেও বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তো দূরের কথা, আদিবাসীদের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিকাশ, সংরক্ষণও সুনিশ্চিত হয়নি বলে দাবি করেন।

শেষে সমাবেশ থেকে (১) আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে; (২) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা আসন বৃদ্ধি করতে হবে; (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং (৪) জাতীয় পাঠ্য-পুস্তক থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শব্দটি বাতিল করে আদিবাসী ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি দাবিনামা উত্থাপন করা হয়।

মাটিরাঙ্গায় জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে পিসিপির সমাবেশ

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা পাদদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি মাটিরাঙ্গায় জুম্মদের উপর পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ করা হয়। মিছিলটি অপরাজেয় বাংলা পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে আবার অপরাজেয় বাংলায় এসে শেষ হয় এবং সেখানেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলভ চাকমার পরিচালনায় এবং সভাপতি ক্যারিংটন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র

অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে বান্দরবানে গ্রাম পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির কর্মী সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার নির্দেশনায় গ্রাম পর্যায়ে কর্মী সম্মেলন চলছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রামে বর্তমান পরিস্থিতি, অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও আন্দোলন জোরদারকরণ বিষয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশনার মধ্য দিয়ে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ, বিগত ১৮ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করা, উপরন্তু চুক্তিবিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান অসহযোগ আন্দোলন বেগবান করার জন্য জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তারাছা ইউনিয়নঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ১১টায় জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের তারাছা এলাকায় তারাছামুখ তালুকদার পাড়ায় ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হ্লাচিংমং মারমার সভাপতিত্বে এক কর্মীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা, সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ক্যবা মং মারমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক উচসিং মারমা ও রোয়াংছড়ি থানা কমিটির সভাপতি অংশৈমং মারমা। সম্মেলনের শেষ দিকে জনসংহতি সমিতি, মহিলা সমিতি ও যুব সমিতির ৩নং ওয়ার্ড কমিটিও গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা কমিটির সভাপতি উ অংশৈমং মারমা।

কুহালং ইউনিয়নঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ১১টার সময় কুহালং ইউনিয়নের ৩নং রাবার বাগান চন্দ্রলাল কার্বারী পাড়ায় রাবার বাগান ইউনিট কমিটির সভাপতি চন্দ্রলাল কার্বারীর সভাপতিত্বে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমা ও সদর থানা কমিটির সদস্য রাক্কয়াপু তঞ্চঙ্গ্যা। অপরদিকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ১১টায় একই ইউনিয়নের চেমীডলুপাড়া গ্রামে স্থানীয় কমিউনিটি হলে সমিতির ইউপি কমিটির সভাপতি মংবাথোয়াই কার্বারীর সভাপতিত্বে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উ উছোমং মারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমা, সাধারণ সম্পাদক পুশৈথোয়াই মারমা, ইউপি কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ঝর চাকমা রনেল, সাংগঠনিক সম্পাদক চিংসিংমং মারমা ও গ্রাম কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। কর্মী সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান অসযোগ আন্দোলন বেগবান করার জন্য জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সুয়ালক ইউনিয়নঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ১১টায় সুয়ালক ইউনিয়নের সুয়ালক মাঝের পাড়া বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন মাঠে সমিতির ইউপি কমিটির সহ-সভাপতি ক্যপ্রুথোয়াই মারমার সভাপতিত্বে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সদর থানা কমিটির সহ-সভাপতি থোয়াইঅংগ্য মারমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মংক্যউ মারমা, সুয়ালক ইউপি কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রুহ্লাঅং মারমা, সদর ইউপি কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক চিংহ্লামং মারমা ও গ্রাম কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

প্রতিনিধিত্বহীন জাতিসমূহের কূটনীতিকদের কর্মশালায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

গত ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০১৬ আনরিপ্রেজেন্টেড নেশনস এন্ড পিপল্‌স অর্গানাইজেশন (ইউএনপিও), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তিব্বত জাস্টিস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ স্কুলে অনুষ্ঠিত "দি বিগার পিকচার: স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাট এডভোকেসী" শীর্ষক কর্মশালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা অংশগ্রহণ করেন।

'অপ্রতিনিধিত্বশীল জাতিসমূহের কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণ ঃ কার্যকর জাতিসংঘের লবির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উলেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ইউএনপিও এর অন্যতম সদস্য। দু'দিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন অধিবেশনে নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান আলোচক হিসেবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউএনপিও-এর পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল তিব্বত নেটওয়ার্ক, মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, তিব্বতের জন্য কূটনীতিক ও মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উক্ত কর্মশালায় মোট ১৩টি আনরিপ্রেজেন্টেড নেশনস বা প্রতিনিধিত্বহীন জাতির মোট ১৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণ শেষে এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা লন্ডনে বসবাসরত জুম্মদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া তিনি লন্ডনে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর সদর দপ্তরে আদিবাসী বিষয়ক বিভাগ ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে স্বাক্ষাত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করেন।

লর্ড অ্যাভেবুরির মৃত্যুতে জনসংহতি সমিতির গভীর শোক প্রকাশ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রবিবার ৮৭ বছর বয়সে এরিক রিজিনাল্ড লুব্বক, লর্ড অ্যাভেবুরির মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর শোক জানিয়েছে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার স্বাক্ষরিত শোক বার্তায় বলা হয়েছে যে, লর্ড অ্যাভেবুরির মৃত্যু মানবজাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ তাদের অন্যতম নিকটতম ও প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়েছে, যিনি আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ারম্যান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে গেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর কয়েকবার পরিদর্শন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মানবাধিকার ও জাতীয় অস্তিত্ব সুরক্ষায় তাঁর প্রশংসনীয় অবদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁকে স্মরণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে তাঁর অক্লান্ত প্রচারকার্যের জন্য জনসংহতি সমিতি তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করে, যা ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি লর্ড এরিক অ্যাভেবুরির শোকাহত পরিবার ও যুক্তরাজ্যের মহান জনগণকে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন- +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল : pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা